অঞ্জলি
১৪২২
Gopaal Sen
2015
ANTALI 2015 : DURGA PUTA MAGAZINE

প্রচ্ছদ শিল্পী গোপাল সেনঃ

ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথিতযশা আমেরিকান সমসাময়িক শিল্পী। বিভিন্ন উচ্চমানের চিত্রশালায় তাঁর ছবির প্রদর্শনী দর্শকের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছে। সাম্প্রতিককালে তাঁর ছবি International Contemporary Artist Publication, এ ছাড়া Hidden Treasures Art Journal of London এ তার ছবি নির্বাচিত হয়েছে (2015)। Hum Magazine , USA, January 2015-তে কভার আর্টিস্ট হিসেবে তাকে উপস্থাপনা করা হয়। Con Corso Buenos Aires Publication, Milan, Italyতে তিনি বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে নির্বাচিত।

আমেরিকায় বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় গোপাল সেনের শিল্পকর্মের নমুনা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও নিপীড়িত মহিলাদের সাহায্যার্থে তাঁর ছবির নিলামে প্রাপ্ত অর্থ প্রেরণ করা হয়। আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ইমামী কোম্পানী গোপাল সেনের এক মাস ব্যাপী এক বিশাল একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয়-আমেরিকান , যিনি এই সম্মানের যোগ্য হলেন।

সূচীপত্র

আমাদের পূজো ~ উৎপল রায়চৌধুরী 3
সম্পাদকীয় ~ প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি 4

স্মৃতিচারণ

অরিন্দমদা - স্মৃতির মণিকোঠায় ~ উৎপল রায়চৌধুরী 6
আমাদের অরিন্দমদা ~ সুবিজয় দত্ত 8
Remembering Arindamda ~ Subimal Chatterjee 9
Nihsheshe Pran ~ Monish R. Chatterjee 11
A Tribute ~ Kasturi DasGupta 14

ছোটদের পাতা

Poems ~

Durga Devi ~ Madhavan Murali 17
Poetry& Trampoline ~ Ella Bagchi 18

Drawings

Lisa Singh 19
Reah Singh 20
Banshika Mangal 21

Article

Blue Bells High School ~ Sriram B. Chakravadhanula 22

কবিতা

যদি কিছু দিতে চাও ~ ব্রততী মজুমদার 25
এলোনা ~ গঙ্গোত্রী সরকার 25
আগন্তুক ~ সুরমা দাশ 26
আত্মপরিচয় ~ সন্ধ্যা মজুমদার 28
Connections ~ Sushma Madduri 63

প্রবন্ধ

রবি ঠাকুর, পূজোর গান এবং গানের পূজা ~ অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় 29
ছেলেবেলার স্মৃতি-চারণ ~ সুশোভিতা মুখার্জি 44
যোগ সাধনার দ্বারা জাগৃতি ~ শাস্ত্রীজী 52
শ্রী কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও রাখিবন্ধন ~ নীলিমা চক্রবর্তী 54
Night Queen ~ Sheema Roychowdhury 62
My American Sojourn ~ Nita Mitra 64
A Puja from the Sixties ~ Asish Mukherjee 66
Naa Uniki ~ Sushma Madduri 76

বড় গল্প

9-11 ~ গৌতম সরকার 31
মন্টব্ল্যাংক ~ প্রভাত কুমার হাজরা 46

রম্যরচনা

পুরুষাসুরেরা নারীর বধ্য ~ অজয় চক্রবর্তী 41
মানুষের আয়ুষ্কাল ~ অনাবিল সিদ্ধান্ত 51

ভ্রমণ

সাগর সঙ্গমে ~ মায়া ব্রহ্ম 39
ওঙ্কার-ধাম দর্শন ~ প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি 55
Wild Wild West ~ Vaswati Biswas 70

চিত্রকলা

Anika Kumbhakar 60
Amrita Banerjee 61

প্রচ্ছদ : গোপাল সেন
অলঙ্করণ : সোহিনী ব্যানার্জি

Message from the Board

Dear Friends:

The Greater Binghamton Bengali Community will celebrate Durga Puja October 24, 2015. We are proud to announce that this will be our eighth celebration of this joyous occasion. The continuation of this successful endeavor has been possible because of tremendous support from the patrons and the interested community members from the region. We sincerely hope that the trend will continue in foreseeable future. We take this opportunity to thank all of our volunteers for their active involvement in the planning and execution of all aspects of the program. Their dedication and unwavering support cannot be overemphasized.

This year, the early evening program will showcase local talents and the after dinner music extravaganza will reflect a touch of Bollywood. We cordially extend our invitation to your family and you to join us on this festive occasion and make the Durga Puja celebration a grand success. We hope to greet you with our warm **'Sharodiya namaskar'** on the morning of October 24, 2015.

Sincerely

2015
Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
http://www.binghamtonpuja.org

আমাদের পূজো

উৎপল রায়চৌধুরী

দিন গুলো সত্যিই দেখতে দেখতে কি ভাবে যে কেটে যায়, সেটা যেন আর বোঝাই যায় না। পূজো আবার দরজার কড়ায় নাড়া দিচ্ছে। মা দুর্গা যেন ডেকে বলছেন, ‘এই, তোদের সবার খেয়াল আছে তো? আমার বাড়ী যাবার সময় তো হয়ে এল বলে’। মনে মনে বলি, ‘কেমন করে ভুলি মা সে কথা? আমরাও তো তোমার আসার পথ চেয়ে বসে থাকি সারা বছর’। এক এক সময় ভাবতে বসলে একটু অবাকই হয়ে যাই – এ বছর আমাদের পূজো যে অষ্টম বছরে পা রাখল।

আট বছর আগে বিংহ্যামটন বিশ্ব বিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে আসা দুজন ছাত্র, বিপ্লব আর অভিজিৎ দেশের পূজোর খুবই অভাব বোধ করছিল। হয়তো বা খানিকটা খেয়াল খুশীর বশেই তারা ভেবে বসল, ‘এখানে পূজো করলে কেমন হয়?’ সেই থেকে শুরু। সেদিনকার সেই ছোট্ট পুজো আজ অনেকটাই পরিণত হয়েছে নানা জনের নানা অবদানে। শুধু শহরের অল্প কজন বাঙ্গালী পরিবারই নয়, একশ মাইলের মধ্যে যে বাঙ্গালীরা আছেন, তাদের অনেকেই আসেন আমাদের সাথে যোগ দিয়ে পূজোকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে। আজকাল অনেক স্থানীয় অবাঙ্গালী পরিবারও সামিল হন আমাদের অনুষ্ঠানে।

পরিবর্তনের ছোঁয়ার নাগাল এড়িয়ে যাবে, পৃথিবীতে কোনও কিছুরই সে সাধ্য নেই। আমাদের পূজোই বা কি করে তার ব্যতিক্রম হবে? একটু একটু করে কখনও বা চেনা মুখগুলো অনিবার্য কারণে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়, আবার নূতন মুখের ভীড় সে শূন্যতাটুকু ভরে দেয় সকলের অজান্তে। আমাদের পূজো আয়তনে খুবই ছোট, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরপুর। তাই কেউ চলে গেলে আমরা সবাই অনেক দিন ধরে তাদের কথা বলাবলি করি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সবাই সমবেত হলেই কে কোথায় কি করছে, সব খবরের আদান প্রদান হয়।

সেদিন ইমেল খুলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পেলাম একটা ইমেল বিপ্লবের স্ত্রী দেবলীনার কাছ থেকে। ওরা এখন থাকে টেক্সাসে। বিংহ্যামটন থেকে অনেক দূরে। দেবলীনা জানাল ওরা এবারের পূজোয় বিংহ্যামটন আসবে আমাদের পূজোয় যোগ দিতে। অভিজিৎ এখন দেশে। কিন্তু কোনও পূজোয় হঠাৎ করে ওকেও এখানে দেখতে পেলে আমি অবাক হব না। আমাদের পূজোর এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, সবাই একান্ত আপন করে নিই পূজোর সব কাজ, প্রাণের টান জড়িয়ে থাকে প্রতি মুহূর্তের আনন্দে। বড় শহরের বড় পূজোর তুলনায় জৌলুস কিম্বা অতিথির সংখ্যা হয়ত কম, কিন্তু এই আন্তরিকতা তো সব জায়গায় পাওয়া যায় না। আমি ভাবি, এই খানেই আমাদের পূজোর সার্থকতা।

সম্পাদকীয়

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

দুর্গাপূজা বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব।বাঙালির, ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিকতা; সবকিছু মিলেমিশে আছে তার দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে। সভ্যতার শুরু থেকেই, নারী বা প্রকৃতিকে পূজা নিবেদন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত। দেবী দুর্গাকে আমরা মাতৃ-মূর্তিতে আহ্বান করি কারণ মা আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ, মায়ের সঙ্গে সন্তানের ভালবাসার বন্ধন অচ্ছেদ্য।

মা দুর্গাকে মহা-শক্তিরূপে উপাসনা করা হয়, দুর্গা শব্দের অর্থ অনধিগম্য বা নাগাল-বহির্ভূত। মা দুর্গার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারনাগুলি অবশ্য আপাতবিরোধী। দুর্গাকে নানা রকম রূপে ও বিভিন্ন নামে বন্দনা করা হয়ে থাকে; মায়ের রূপ কখনও শান্ত ও কোমল, মায়ের নাম তখন গৌরী বা উজ্জ্বলা, উমা অথবা জ্যোতির্ময়ী, কিংবা পার্বতী; আবার এই পরম দয়াশীলা জগন্মাতাই দুষ্টের দমনের কারণে ভয়ঙ্করী মূর্তিও ধারণ করে থাকেন, তখন মাকে আমরা কালি, চণ্ডী বা ভৈরবী বলে ডাকি, এই মা সিংহবাহিনী রূপে মহিষাসুর-বেশী অন্যায়ের বা অজ্ঞানতার দমন করে স্বর্গ ও মর্তে শান্তি আর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

মনে প্রশ্ন জাগে কবে সুরু হয়েছিল এই দেবী বন্দনা? প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতাতেও মাতৃ-উপাসনার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে দেবী-আরাধনার উল্লেখ আছে, প্রকৃতি-পূজার উৎপত্তির হদিশ করে পণ্ডিতেরা দেখেছেন, দেবীকে সর্বপ্রথমে অদিতি নামে উল্লেখ করা হয়েছিল, অদিতি বলতে শক্তি বোঝায়, বহু ধর্মগ্রন্থে অদিতিকে দুর্গা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অদিতিকে সকল প্রাণীর মা বলে মনে করা হয়। আন্দাজ মতো চার শতাব্দী নাগাদ মা দুর্গার মহিষাসুর নিধনের মূর্তি ভারতবর্ষের রাজবাড়িগুলিতে দেখা যেতে সুরু হয়। দেবীমাহাত্ম্য নামক পুস্তকে মা দুর্গা সংক্রান্ত মতাদর্শের বর্ণনা পাওয়া যায়; এখানে বলা হয়েছিল; দেবী যদিও অনন্ত, তথাপি জগতকে অন্যায় থেকে রক্ষা করতে তিনি অবতার রূপে মর্তে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

মূর্তিপূজার প্রচলন সম্ভবত: মানুষকে সুযোগ দিয়েছে আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ করতে সেই পুরাকাল থেকে। মূর্তি-রূপে ভগবান সহজভাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়ে থাকেন, আমরা তখন দেবতাদের নিকটে আশীর্বাদ চাইতে পারি, জানাতে পারি আমাদের সকল অভাব ও অভিযোগ। এইজন্য পূজার আচার ও অনুষ্ঠানসমূহকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এই অধরা মাতৃ-মূর্তি হয়ে যায় আমাদের কাছের মানুষ; দেবী দুর্গা চারটি ছেলেমেয়ে সহ প্রতিবছর আসেন পিতৃগৃহ মর্তে, আবার পাঁচদিন পরে পুজাশেষে মা বাবাকে কাঁদিয়ে ফিরে যান কৈলাসে···স্বামীর কাছে। আর আমরাও গঙ্গার জলে মূর্তি বিসর্জন দিয়ে চোখের জলে ভাসি আর ভাবি আসছে বছর আবার হবে।

দুর্গাপূজা শুধুই বাঙালির উৎসব নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানা ভাবে মা দুর্গার পূজা হয়, এবং অসংখ্য দুর্গা-মন্দির ভারত ও তার আশে পাশে ছড়িয়ে আছে, যেখানে বিভিন্ন নামে মা-দুর্গার পূজা হয়। যেমন জম্মু ও কাশ্মীরের বিষ্ণু-দেবী, , হিমাচল প্রদেশের চামুণ্ডা দেবী, আসামের কামাখ্যা, গুজরাটের অম্বা-মাতা, উত্তর প্রদেশর নয়না-দেবী, দক্ষিণেশ্বরের মা কালি, অন্ধ্র প্রদেশের কনক-দুর্গা, নেপালের ভদ্রকালী, গয়ার মঙ্গলা-গৌরী, মহিশূরের চামুণ্ডেশ্বরী, এবং আরও অনেক অনেক এই ধরনের মন্দির ভারতবর্ষ ও তার আশে পাশে অবস্থিত।

দুর্গাপূজা করা সহজ কথা নয়, কারণ অসীম ভক্তি, ভালবাসা, ও নিষ্ঠা ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপকরণ, আয়োজন আর নিয়মের সঙ্গে মায়ের আহ্বান করাই প্রচলিত সংস্কার। তাই আমাদের এই ছোট্ট শহরের অতি ক্ষুদ্র, খানিকটা অস্থায়ী, বাঙালি সমাজ গত কয়েক বছর ধরে বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে এই কঠিন দুর্গাপূজা সম্পন্ন করতে পারছে বলে আমরা একাধারে গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ। তবুও এবারের পূজোর আনন্দের উচ্ছ্বাস ঠিক তেমনিভাবে মনকে মাতায় না, কারণ সামান্য কয়েকমাস আগেই এই সমাজ হারিয়েছে একজন প্রাণের মানুষকে। ডাঃ অরিন্দম পুরকায়স্থের সঙ্গে এখানকার সকলের ছিল নিবিড় যোগাযোগ, সবাইকার সুখে ও অসুখে জড়িয়ে ছিলেন তিনি, এমন একজন সুহৃৎ সদস্যের অনুপস্থিতি, মেনে নিতে মন চায়না, তবে বাস্তব কখনও বড়ই নির্মম, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মূল্য দেয়না । আমরা শুধু জানাতে পারি আমাদের সবাইকার বুকভরা ভালবাসা ও শুভকামনা ডাঃ অরিন্দম পুরকায়স্থের দুই সুযোগ্য কন্যা তানিয়া ও অমৃতাকে।

DR. ARINDAM PURKAYASTHA

(1940 – 2015)

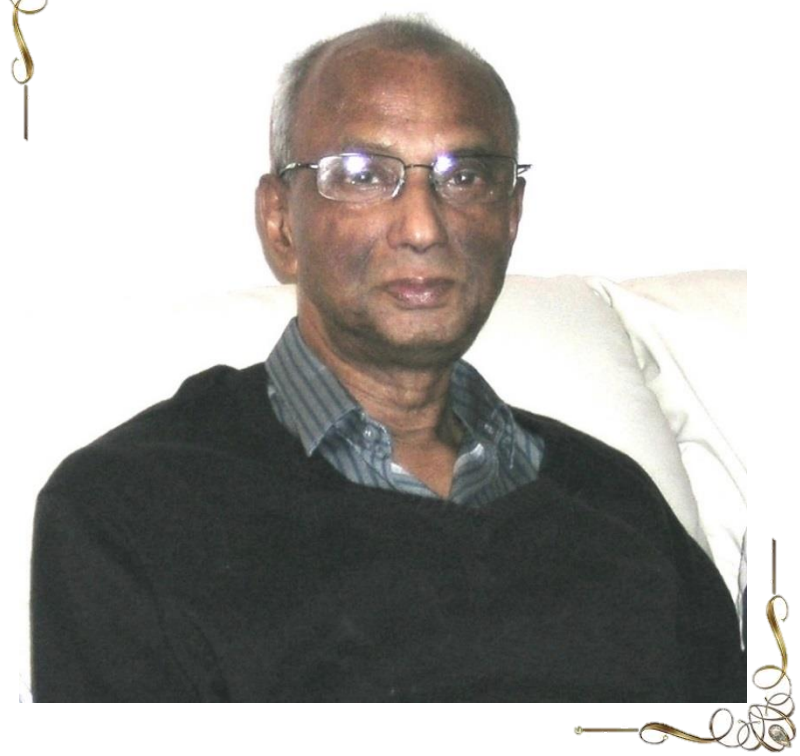

An Embodiment of Service

I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.
Rabindranath Tagore

Service which is rendered without joy helps neither the servant nor the served. But all other pleasures and possessions pale into nothingness before service which is rendered in a spirit of joy.
Mahatma Gandhi

Joy can only be real if people look upon their life as a service and have a definite object in life outside themselves and their personal happiness.
Leo Tolstoy

অরিন্দমদা - স্মৃতির মণিকোঠায়

উৎপল রায়চৌধুরী

আমাদের সর্বজন প্রিয় 'অরিন্দম দা' বা 'অঞ্জন দা' অর্থাৎ ডক্টর অরিন্দম পুরকায়স্থ আজ আর আমাদের মাঝখানে নেই। এই শূন্যতাবোধ কারণে অকারণে আমাদের অনেকের মনকেই ভারাক্রান্ত করে তোলে। অনেক সময়ই আমরা অনুভব করি আমাদের এই অপূরণীয় ক্ষতি। আজ আমি আমাদের স্থানীয় বঙ্গসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজেকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রাখি। সে কাজে অরিন্দমদার অকুণ্ঠ সমর্থন আর প্রেরণা আমাকে গভীর ভাবে শক্তি দিয়েছে সব সময়। তাই 'অঞ্জলি – ২০১৫' এর মাধ্যমে ওঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার এই সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমার মনে হয় যে, অরিন্দমদাকে যেটুকু জেনেছিলাম ছোট বড় নানা ঘটনার মাধ্যমে, তারই অল্প কিছু স্মৃতি রোমন্থন ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে হবে যথার্থ।

কোথায় শুরু করি? আচ্ছা, যে সব পাঠক পাঠিকা পড়বেন এই লেখাটুকু, তাঁদের কেউ কেউ হয়ত বা নাও জানতে পারেন, তাই প্রচ্ছদ পট হিসেবে সংক্ষিপ্ত দু একটা কথা বলতে চাই। অরিন্দমদার জন্ম হয়েছিল ১৯৪০ সালে, শ্রীহট্ট জেলায়, বর্তমানে যা বাংলাদেশের 'সিলেট'। ছোটবেলার পড়াশুনা করেছিলেন শৈলনগরী শিলঙে। ম্যাট্রিক শিলঙের লাবান স্কুল থেকে পাশ করলেন, শিলঙেরই সেন্ট এডমান্ডস কলেজ থেকে তখনকার দিনের আই এস সি পাস করলেন। অরিন্দমদা তারপর কোলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন। তিনি এদেশে চলে আসেন ১৯৬৮ সালে। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন ২৭ মে, ১৯৭৩ সালে শিলঙেরই মেয়ে শ্রীমতী দীপা চৌধুরীর সঙ্গে।

অরিন্দমদার আমেরিকা আসবার প্রসঙ্গে একটা মজাদার গল্প আছে। আমার সমস্যা হল আমি একেবারেই গল্প বলতে পারি না। আর অরিন্দমদা ছিলেন গল্প বলার জাদুকর। একই গল্প ওঁর মুখে দু তিন বার শুনলেও সেই গল্পের নতুনত্ব থাকত। তবুও সংক্ষেপে বলি। পাশ করবার পর অরিন্দমদা কিছুদিন দিল্লীতে কাজ করেছেন। অত্যন্ত লোভনীয় চাকরি। রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসার অনুমতি দিতে হবে। ওঁর খাস আর্দালি একদিন বলল, "সাব, বহুত আচ্ছা নোকরি মিলা আপকো। জলদি মে বহুত পয়সা বনায়েঙ্গে"। একটু খটকা লাগলেও কিছু বললেন না। তারপর একদিন অনুরোধ এলো পরিচিত এক সহকর্মীর কাছ থেকে। সেই ভদ্রলোকের সম্পূর্ণ সুস্থ বউকে মানসিক রোগ গ্রস্ত বলে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে যাতে উনি একটা সরকারি কোয়ার্টার পাকাপাকি ভাবে পেয়ে যান, অন্যথায় যেটা ওঁর পাবার কথা নয়। বিনিময়ে ভদ্রলোক অরিন্দমদার একটা কিছু আটকে থাকা সরকারি কাজ করে দেবেন। সেদিনই অরিন্দমদা সিদ্ধান্ত নিলেন, আর নয়, যত দিন যাবে, এখানে থাকলে আস্তে আস্তে নিজের অজান্তেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে যেতে বাধ্য হবেন। তার চাইতে অনিশ্চয়তায় ভরা হলেও উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়াই শ্রেয়। চলে এলেন এখানে। আর আমি জানলাম ওঁর চরিত্রের একটা দিক যেখানে আর্থিক বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের চাইতে নীতিপরায়নতার মূল্য বেশী।

আমেরিকায় এসে ট্রেনিং পর্বের শেষে বিংহ্যামটনের কাছে উইন্ডসরে স্থিতি নিলেন অরিন্দমদা। দীপাবৌদি আর ওঁর আতিথেয়তার কথা ছিল সুবিদিত। অবারিত দ্বার ছিল ওঁদের সবার জন্যে। আমরা নিজেরাই কতবার গিয়েছি ওঁদের বাড়ী। জমাটি মজলিশী আড্ডা আর সঙ্গে বৌদির রন্ধনশৈলীর অফুরন্ত প্রকাশ। সঙ্গে থাকত নানা ধরনের আলোচনা। ওঁর সাহিত্য প্রীতির বহিঃপ্রকাশ। কখনও বা গানের পালা। ওঁর প্রাণ প্রাচুর্যের প্রকাশ ছিল সর্বত্র। কতবার দেখেছি ওঁকে পূজোর সময় রাতে দীপাবৌদিকে সাথে টেনে নিয়ে নাচের আসরে নেমে পড়তে। সেই সব জমায়েত এর স্মৃতি আজও মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

শুধু বাড়ীতে পরিচিত প্রিয়জনের মিলন মেলার মধ্যেই সীমিত থাকতো না ওঁর সকলকে মিলিয়ে দেবার প্রয়াস। শুরু করেছিলেন সরস্বতী পূজো উইন্ডসর শহরে। সে দিনের সেই ছোট্ট প্রচেষ্টা সময়ের সাথে সাথে আজ অনেকখানি পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছি অরিন্দমদার প্রচেষ্টাকে আরও বিস্তৃত করতে – প্রত্যেক বছর সরস্বতী পূজো, নববর্ষ এবং দুর্গাপূজো পালন করে। 'সবারে করি আহ্বান' - এই ছিলো তাঁর অন্তরের ইচ্ছে। তাই আজ আমাদের দুর্গাপূজো হয়ে ওঠে স্থানীয় বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী সবার মিলন ক্ষেত্র।

অরিন্দমদার সাথে আমাদের প্রথম পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিলো পুরোটাই ওঁর প্রচেষ্টায়। আমাদের মাঝখানে একটা নিবিড় যোগসূত্র ছিল বহু দূরের শৈলনগরী শিলঙের মাধ্যমে। আমরা অনেকেই আমাদের ছেলেবেলার মায়াময় দিনগুলো কাটিয়েছি পাইন বনে ঘেরা শিলং

পাহাড়ের কোলে। তারপর জীবনের দাবি মেটাবার জন্যে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়েছি আমরা। কেউ বা এসেছি আমেরিকার নানা জায়গায় স্থায়ী ভাবে থাকার জন্যে। অরিন্দমদা কিন্তু কখনও শিলঙের সেই নাড়ীর টানটি ভুলতে পারেননি। নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমেরিকা প্রবাসী সবার সাথে যোগাযোগ করেছেন, যারা কোনও না কোনও সময় শিলঙের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক দুই বা তিন বছর পর আয়োজন করেছেন 'শিলং সম্মেলন' অনুষ্ঠানের, যেখানে আমরা সবাই একে অন্যের সাথে যোগাযোগ নবীকরণ করেছি এক অনন্য আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে।

তারপর পট পরিবর্তন হয়েছে। অনেক কিছুই বদলে গেছে কিন্তু বদলায় নি অরিন্দমদার সবাইকে আপন করে নেবার ধারা। কিছুদিন আগেকার কথা। সীমা আর আমি যাব ওঁর সাথে দেখা করতে। ফোনে আমায় বললেন, "দাও তো সীমাকে ফোনটা"। ওকে বললেন, "সীমা, শোনো, অনেক স্যামন রেঁধে আমায় খাইয়েছ, এবার স্যামন আনতে হবে না। ভালো করে বেগুন দিয়ে ক্যাটফিশ নিয়ে আসবে আমার জন্যে। আর ফুলুরিটাও নিয়ে আসতে ভুলো না"। সীমার চোখ এখনও মাঝে মাঝে ছলছল করে ওঠে এগুলো মনে করলে। বলে আমাকে, "এমন আপন করে আর কজনই বা বলবে"? এটাই ছিল অরিন্দমদার ধারা। সবাইকে আপন করে নেবার এক অদ্ভুত সহজাত ক্ষমতা ছিল ওঁর।

গত বছর আমরা স্থানীয় 'ইন্ডিয়া ডে' যাপন করবার সময় পূর্ব ভারতের পরিচিতি হিসেবে একটা স্টল দিয়েছিলাম। অরিন্দমদা আমাদের এই প্রচেষ্টার খবর পেলেন। ওঁর শারীরিক অবস্থার তখন যথেষ্ট অবনতি হয়েছে কিন্তু মানসিক উৎসাহে তিলমাত্র ভাঁটা পড়েনি। আমায় ফোন করে বললেন, "উৎপল, তোমাদের কিন্তু সুন্দর করে একটা প্রোজেক্ট করতে হবে যাতে সবাই বাংলা এবং পূর্ব ভারত সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা নিয়ে ফেরে। ওঁর অকুণ্ঠ বিশ্বাস আর উৎসাহ প্রদান আমাকে যে কতখানি উজ্জীবিত করেছিলো, তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না।। তার চাইতেও আরও উল্লেখনীয় ব্যাপার হল যে অসুস্থ, অশক্ত শরীর নিয়ে উনি নিজে এসেছিলেন অল্প সময়ের জন্যে আমাদের চেষ্টার ফল দেখতে, আমাদের উৎসাহ দিতে। শুধু ওঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল সে কাজ।

অনেকবার অনেক ভাবে এর প্রমাণ পেয়েছি আমি। অজস্র ঘটনা নথি বদ্ধ করবার সময় নয় এখন। প্রয়োজনও নেই তার। তবে আরও একটা ব্যাপারের উল্লেখ না করলে এই ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ক বছর আগেকার কথা। আমার হার্টটা হঠাৎ করেই আর কাজ করতে চাইল না। খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি। সীমা একা এখানে। অন্য আরো বেশ কজন শুভানুধ্যায়ীর মতো সে সময় প্রতিটি রাতে অরিন্দমদা ওকে ফোন করেছেন। সেটা ছিলনা পরিচিতের সামাজিক বাধ্যতা, এমন কি ছিলনা তা চিকিৎসকের অনুসন্ধিৎসা। প্রিয়জনের উৎকণ্ঠার ছাপ ছিল ওঁর প্রতিটি সংলাপে। সে মুহূর্তে সীমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল সেই মানসিক জোর টুকুর যা সে পেত ওঁর সাথে কথা বলে। অরিন্দমদার সংস্পর্শে যারা এসেছেন, তাঁদের অনেকেই হয়ত নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের এই অনুভূতিগুলো সমর্থন করবেন। আবার বলি, অরিন্দমদা সব সময় সবার সাথে যোগাযোগ রাখতেন, সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। এটা ছিল ওঁর চরিত্রের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পড়বার নেশা ছিল অরিন্দমদার আর তার ব্যাপ্তি ছিল বহু বিস্তৃত। তাঁর বইয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সাহিত্য, ইতিহাস, সমসাময়িক রাজনীতি, ধর্মগ্রন্থ – সব রকম বই থাকত বাড়ীর লাইব্রেরীতে। অরিন্দমদার নির্দেশ অনুযায়ী সে সব বই বিলিয়ে দেয়া হয়েছিল ওঁর স্মৃতিচারণ সভায়। অন্য অনেকের মত আমিও বেশ কটা বই নিয়ে এসে ছিলাম। ছেলেবেলায় শারদীয়া পূজোবার্ষিকীগুলো অনেক দিন ধরে একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে পড়তাম। কারণ পড়ে ফেললেই তো শেষ হয়ে যাবে। কেন জানিনা, অরিন্দমদার বইগুলোর সম্বন্ধে এ রকমই একটা মনোভাব কাজ করে আমার। অনেক খানি সময় নিয়ে আস্তে আস্তে এক একটা বই পড়ছি কয়েক পাতা করে। বইগুলো পড়ার সময় মনে হয়, তিনি যেন কাছাকাছিই আছেন। আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে অনেক দূরে কোথাও চলে যান নি ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির পর থেকে।

দুপুর তিনটের সময় বা রাত দশটায় আজ আর হঠাৎ করে আমার সেল ফোনটা বেজে ওঠে না। সেই নীরবতা আমায় মনে করিয়ে দেয় এক অধ্যায়ের সমাপ্তি। তারই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় একটা জীবনের কথা, যা ছিল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণাও যে প্রাণ প্রাচুর্য কে দমিয়ে রাখতে পারেনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। কখনও বা বসে ভাবি কিভাবে চাইব আমাদের মনে ওঁর স্মৃতির রেশ টুকু রেখে দেবার। বিশিষ্ট শল্য বিশারদ চিকিৎসক হিসেবে, না কি ওঁর সবাইকে আপন করে নেওয়ার সহজাত ক্ষমতার, ওঁর সবার জন্যে প্রয়োজন মত সাহায্যের প্রয়াস, না কি ওঁর সংবেদনশীল মানসিকতার। আবার কখনও বা ভাবি, এভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখবার তো কোনও প্রয়োজন নেই। এই সবকিছু মিলিয়েই ছিলেন তিনি। সব সময় চাইতেন সবার মঙ্গল হোক। অরিন্দমদার জীবনের এই জয়গানকে সব চাইতে গুরুত্ব দিয়ে আমার এই স্মৃতিচারণ টুকু শেষ করি।

আমাদের অরিন্দমদা

শিলঙ পাহাড়ের চূড়া থেকে
অবিরল ভালবাসার ঝরনা
বিলিয়ে দিত সে চতুর্দিকে
গড়েছিল শিলং ফোকাস - একটি ছোট্ট গ্রুপ
শ্বাস নিশ্বাসে একই প্রশ্ন - চলছে, চলবে কি অপরূপ ?

শিলঙ পাহাড় ছেড়ে নেমে যেত উদ্যমে
যাবে শিলচর পাশে কুমারদার আশ্রমে
সে এক মহান ঠান, বিশাল ভালবাসার উদ্যান
কল্যানী হাসপাতাল - আকাশ পাতাল
গরীব ধনী - একই চাল, একই খেয়াল।
একই রাস্তা একই ব্যবস্থা।
করলো কারা ? অরিন্দমদারা।
দূর সুদূরে এখানে ওখানে
দিয়ে যেতো সে নির্বিকারে
এপারে ওপারে বহুজনারে
থেকে যাবে চিরতন
সেই ভালবাসার দান - এক মহা অবদান।

সুবিজয় দত্ত
১৯শে জুলাই, ২০১৫

Remembering Arindamda

Subimal Chatterjee

When I wrote about Dipadi in the Anjali columns in 2011, one part of my mind was thinking about Arindamda even then, and how he would live his life without Dipadi around. Now that Arindamda, too, is no more, I often think about his last few years and how fortunate Sudipta and I were to be a small part of those moments.

I am sure that it was difficult for him not to have Dipadi around to manage his life but he did the next best thing. He simplified his life, and, perhaps to the chagrin of Paula, a bit too much and too soon. I remember Arindamda telling us how Paula had stormed away from home with her dog upon learning that he had given away Dipadi's Corningware (along with some of Paula's Tupperware) to a friend. And Arindamda, not quite knowing what to do, did the next best thing as he usually does – he called Dola to gauge just how angry Paula could be, and how long it would take her to come home. It was so touching and yet so side-splittingly funny that we could not stop laughing.

There was no sadness or bitterness in Arindamda in those years, but just a desire to live his life just the way he wanted to. On those days when the dosage adjustments did not work, he would just say that he was a bit under the weather (a cough or cold perhaps) and he would be fine soon. And sure enough, he would call one day asking us how we were and we would make plans to see him. I looked forward to those visits and the simple routine that they entailed. Sudipta would bring him a favorite dish or two (vegetable chops perhaps, or khichuri made just the way he liked) and he would smile, transfer the contents to another bowl, wash and dry our containers, and put them on the kitchen table even before we had sat down.

He loved making tea for us – but he knew that Sudipta liked her tea simmered a bit more than his taste – so he would turn around from the stove, bring me my cup, and turn to Sudipta and say it was her turn to make her cup. We would all sit at the kitchen table and talk - how did I like *The Blood Telegram*? What would happen to Obamacare? Would Hillary Clinton be our next President (he had a photo with her – but that is another story)? How was my cholesterol? Was Zantac helping Sudipta control her acid reflux? How were Biman and Uma? Did we know that Deb had performed a cutting edge surgery just the other day, and that too at such a young age?

The day he left that kitchen table and retired upstairs to his bedroom, our heads told us that the end was drawing near. But in our hearts, it could only be a minor setback. And when Kumarda arrived and said that he had come on an open ticket, I laughed and said that he would have to stay for years. We clung to small hopes and cheered mightily when Paula managed to take him to Scranton to drain his lungs so that he could breathe freely. When we left for India in December and asked what he would like, he said that he would love soft sandesh. I thought that perhaps he would want to live another year to see if his Bills would win the Super Bowl under a new coach (I

remember arguing that Rex Ryan had taken the Jets to the AFC championship in his first year with them, and there was no reason he could not do the same with the Bills). Or, he would enjoy having lunch with the first recipient of the Dipa and Arindam Purkayastha scholarship that his daughters had set up at the School of Management. But the simple text from Kumarda on February 26 meant that they were not to be – it just said Arindamda passed away early this morning.

I do not like ending on a sad note because sadness is so unlike of Arindamda – so let me remember how I first met him (and I have the Press and Sun Bulletin to thank for that). My picture in the front page of the Press and Sun Bulletin in the fall of 1997 had intrigued him (not because I was one of the new hires at the University but that I was a Bengali). So he called Monish and asked that I call him – and I am so glad that I did just that and called a complete stranger who would become one of our closest friend and confidant. So I will remember Arindamda living in Windsor, just off Exit 79 on 17 East, first with Dipadi and his two accomplished daughters, and then with Dipadi, and then just by himself – a simple man, who loved sandesh, who never spoke ill of anybody, and lived his life fully and in his way.

Nihsheshe Pran
Offering Life to Its Last Breath

(Remembering Arindam Purkayastha)

Monish R. Chatterjee, Springboro, Ohio

Friend- the treasure chest of your love
Was bottomless. Reared in the lap happy
Of mountain ranges, your generous heart
Rose high as the sky-piercing Himalayas, fullness,
As did your passion for life, your goodwill delectable
For humanity, your affection for the young. Boudi's

About five and twenty years ago, I had
Put together an event honoring Bengal's
World-renowned bard. That joyous gathering well
Deepened our mutual bonds- with time our
Paths intersected further; I learned first-hand
That love of one's land and people remains

Intact even oceans away- there is, there is
The empathetic heart on a foreign shore.
Panchami
About four decades earlier a group of
Talented friends, you had arrived sailing
Saraswati
On the golden boat of high hope. Once in
Your orbit- I came to know them, specialists

In medicine, chemistry, nuclear physics, even
Music- wide and varied their interests. Soon of
You started the bi-annual Shillong Reunion-mots.
And through it, we too became honorary
Shillongites. And we made friendships with a
Variety of talented ones- and through varied

Narratives, developed an appreciation for
Shillong's natural beauty. Boudi and you, thus,

Visitors of distinction. So many joyous
Days and nights have passed in those

Surrounds- discussing literature, poetry,
Sports. In your home there was joy,

Humor unbounded, and always a

Array of food and libations. Joining

Exceptional culinary masterpieces, your
Own *anda-curry* too would find pride of
Place. Your patronage of students was

Known; new admits at the State University
Would benefit from your generosity- at
Festivals, graduations, in health and in

Sickness, Arindam-da and Deepa Boudi
Were their assured refuge. *Vasant*

Would arrive; we would gather at the
Church in Windsor, in worship of

The source of all Knowledge. Accorded
The honor of conducting Mother's *Puja*

I joined others in gaiety and zest to merge
Music, dance and the arts to the pleasures

Communal *khichuri* and your own bon

Then one summer, through the auspices of
Allies Biman and Uma, there arrived the
The baritone-voiced Pijushkanti, with his

Repertoire of Tagore songs. With your
Characteristic verve, you engaged yourself

Bound disparate parts of Bengal together.
"Draft
Those binds extended to greater India, too.
Your warm and inviting home was abuzz with
Kasson
So many gatherings- so many guests and
'95.

My sabbatical year to spend in India. Gladly
projects
Your took charge of the upkeep of our modest
of
Home. Friend- I knew you well, hence felt
your
No hesitation in handing you this task. That
Year, in far-away Prayag, there appeared in
for
Our lives little Wrik Gairik. That year, in
a

Prayag or in Kolkata, we received your phone
Calls. Your benevolence, your friendship were
Thus beyond ordinary measure, rarely, if ever,
Diksha?
Matched by one's kin. You alone, perhaps,
Have always engaged in uninterrupted goodwill.
and
Your zest for life was spontaneous. At annual

Picnics, Bijaya gatherings, New Year soirees-
them
It revealed itself frequently. Cricket in parks
the
And parking lots. Launching Sabarni and Disha
Before an audience as *The Lovebirds of Calcutta.*
Your beneficence extended in many directions.
adequately
Once, I recall, a certain pilot with a *religious* visa
the

Arrived at your door. Despite *Boudi*'s misgivings
Your kindly heart led you to find him a job. Later,
fruition
The story of him sending off suspicious packages

In ensuring his well-earned renown.

This letter, Monish." A musical evening
Combining East and West at Barnes

Ensued. Eureka! Then along came '94-

Work for the public good and creative

Continued unabated. Perhaps the shadow

Death lurking at the doorstep hastened

Urge to act. Monish- please read this fine
Essay on Kumar. Would you translate it

Us? Again, Monish- this lady has written

Fine collection of folktales. A review in
English would help a lot. Yet again- will
You take on translating this book on

Sadly, that task remained unfinished. You
Loved and admired Bengal's great artists

Writers with all your heart. If ever you

Witnessed any literary memorializing of

By my hands- your effusive joy was like

Floodgates had opened. At the very center
Of that gladness was Rabindranath- a great
Symbol of human civilization. To

Honor him you relentlessly provided me

Prodding and the impetus. To what extent
That impossible task has found any

By my feeble hands- only time will tell,

By your hand on board an aircraft reads like a
Mystery novel. Thus, have you found shelter for
Some, medical treatment for others. Lavish with
must.

Praises for others, you have handed out copies of
Bibhas De's book of poems, and informed all of
The achievements of many in work, action and
Other pursuits. Then 2002 came along- and it was
Time for me to leave Binghamton. I know your
Friendly heart felt the pain of this separation-
unimpeded

Yet you visited us one last time with a smile
Upon your face. Within the deepest recess of my
Heart, I carry that image. Even at a distance, I
Remained well within your orbit. Meanwhile,
Your two daughters by turn entered wedded life-
Ailing *Boudi*'s mother's heart was at peace. Your

Perhaps, or perhaps it will not. Monish-
Too desire immortality, do we not? Let
A moment go by not having tried what you

That I bring to you the immortality you
I have neither strength nor the
Perhaps I could repeat the standard line-
Work has made you immortal. But that
Be disingenuous. In this world enriched
Your boundless love, I shall keep

Your goodwill towards the human race-
That is the solemn pledge I assign to myself

Arindam Purkayastha: A Tribute

Kasturi DasGupta, Freehold, New Jersey

September 19, 2015

Dear Utpalda,

I have sat on this assignment that you gave me for more than a month now. I can't wait any longer if I want to say a few things about Anjanda and have the material ready for your publication. It has been difficult to find the right way to begin my homage to him. Should it be a personal offering or a more communitarian one – my own thoughts, or a reiteration of what others have already said?

I decided to take the first approach and that led me on a wild goose chase, which unfortunately took up a few more days. It has to be a couple of decades since this big brown envelope arrived at our house in Freehold, NJ. The address held Anjanda's unmistakable script. With much curiosity I opened it. In a letter he introduced us to the contents of the packet - a dozen or so pages stapled together. As far as I remember the letter was a humble introduction to a compilation of life lessons that the pages contained. Or more specifically small morsels of great wisdom that he gathered in the course of his life – as a father, a spouse, a physician and most importantly as a member of the human family. They had served him well and he was not going to keep it to himself. And so he had sent it to us and others in his circle of family and friends.

I know I have come across those pages, still tucked into the envelope he had sent it in, every time I have rummaged through for something else. But as it always happens, when in the last few days I have looked for it - I just couldn't find it. I am certain this is Anjanda's way of testing how much I remember from those pages as I write this. And I have to be honest, I don't remember the specifics. But I can say with absolute certainty that the spirit of those messages has never left me. In many ways they have continuously reaffirmed for me the fundamental values which are present in their untarnished form in all our hearts. We know in our hearts of heart what the right thing to do, or to say is in any circumstance – but we fail to fulfill them in our lived lives because we often lack the self-assuredness, the self-confidence – very simply the courage to be who we are in the deepest aspects of our spirit. What attracted everyone to Anjanda was the quiet confidence and assuredness that he exuded in everything he did. His self-deprecating humor is a testimony to this certainty he felt in his own being. He knew it wouldn't diminish him in any one's eye – just the opposite, they would ascertain for everyone his deep, unvarnished humanity – albeit flawed like everyone else's. It was a testament to the humility which characterized his interactions with everyone who came across his path. His professional success did not get in the way of the kindness, warmth and gentleness with which he treated everyone. At his memorial service, people

from different walks of his life relayed stories, which were simple and genuine witnesses of just this.

At the memorial service, my husband Anupam recalled Anjanda's integrity and professionalism as a physician. He reminded that what was so unique about Anjanda, the doctor, was how generous and gracious he was in disseminating any medical advice that was sought from him. And when he became aware of a health condition that was affecting someone he knew, he was tireless in inquiring about it, showing a genuine care and concern, somewhat rare in those for whom medicine is a mere livelihood and not a vocation, a mission, as it was for him.

In March of 2009 I was in Kolkata. I had gone there to take care of my younger sister, Kaverri, who was at that point suffering from a relapse of esophageal cancer. I still remember the solace and support I found when Anjanda called to inquire about her. There was very little that could be done at that point, but his soothing tone did more to assuage the grief I felt than anything in terms of treatment options that he might have suggested. I remember vividly standing in the warmth of that early spring evening as his words washed over me with an indescribable gentleness.

We looked forward to our visits to Binghamton. He and Dipdi, his wife Deepa, were a picture of a couple who had found in their relationship an easy, and unforced camaraderie. Their companionship needed no embellishments. It was straightforward and simple, comfortable and unassuming. Dipdi met Anjanda's unconventional ways with a feigned impatience which was a lot of fun to watch, especially because it left Anjanda totally unfazed and not a bit discouraged in whatever his pursuits might have been that had exasperated her.

We basked in the conversations we had when we visited or spoke to him over the phone. He was always interested in engaging Anupam and I in lively debates about the most important topics of the day. He was eager to know the latest thing I was writing about. When I completed the book that my sister had started about our parents, he was one of the first to request a copy. He awaited anxiously for the publication of my book on social inequality and inquired after its progress frequently. It saddens me to no end that the book came out just days after he left us.

As we traverse through life there are those rare people who inspire us, encourage us, and egg us on to do the right thing, be our very best. They uplift and validate us for who we are – make us feel that we matter and that there is value in our living. Arindam Purkayastha did that every day to all who were fortunate enough to cross paths with him. And my greatest tribute to him would be to live my own life with integrity and by being true to my most fundamental human essence with simplicity, generosity and humility, with as little fanfare as possible.

Hope I got this to you on time, Utpalda!!

With best regards,

Kasturi

ছোটোদের পাতা

DURGA DEVI

Madhavan Murali (Age 15)

Deity of Strength and Energy

Shakti ***U***nleashed – Feminine power

Countless demons ***R***elinquished upon her wrath

Personification of trinity, ***G***ranted supreme

Savior of humans and gods ***A***like

Immensely powerful, yet ***D***ivinely graceful

To Mother ***E***arth, I bow

Form ***V***enerated as Uma's manifestation

Invincible and Revered

DURGA DEVI, DURGA my MATHA

Bless us all with your strength and kindness

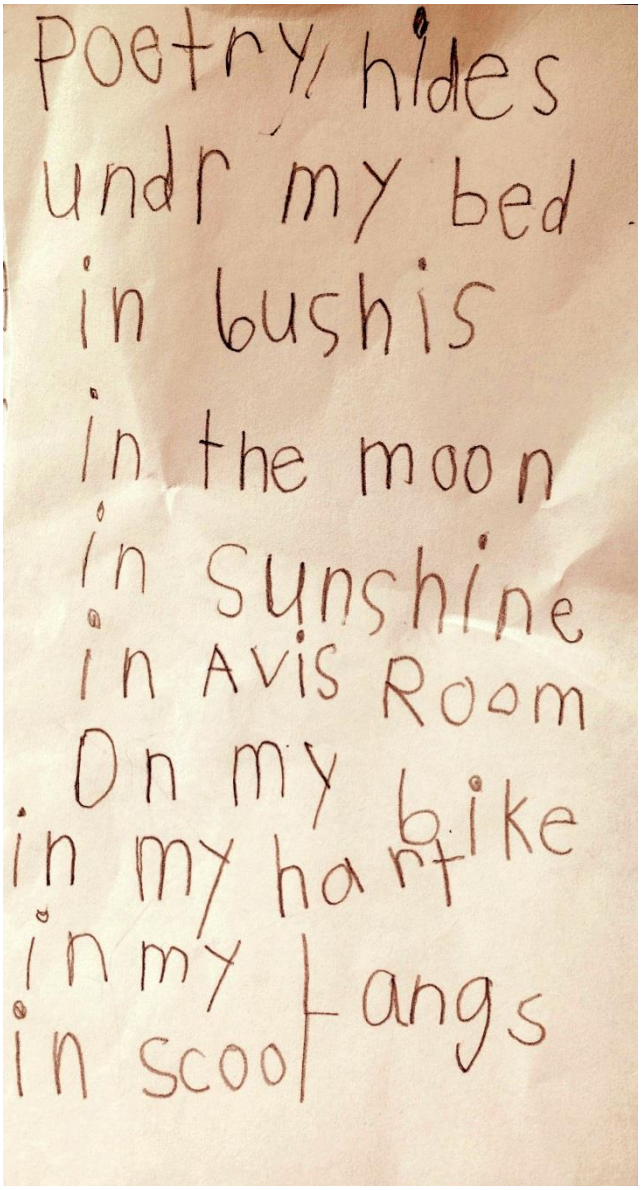

Ella Bagchi
(Age-6)

Poetry hides
undr my bed
in bushis
in the moon
in sunshine
in Avis Room
On my bike
in my hart
in my Lungs
in scool

trampleen

twisting
trning
fliping
floping
run run run
Kortweel
home

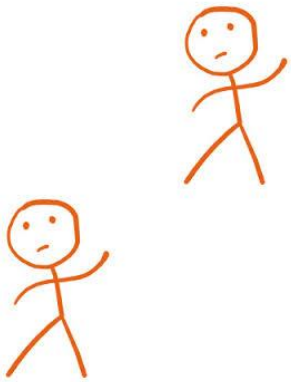

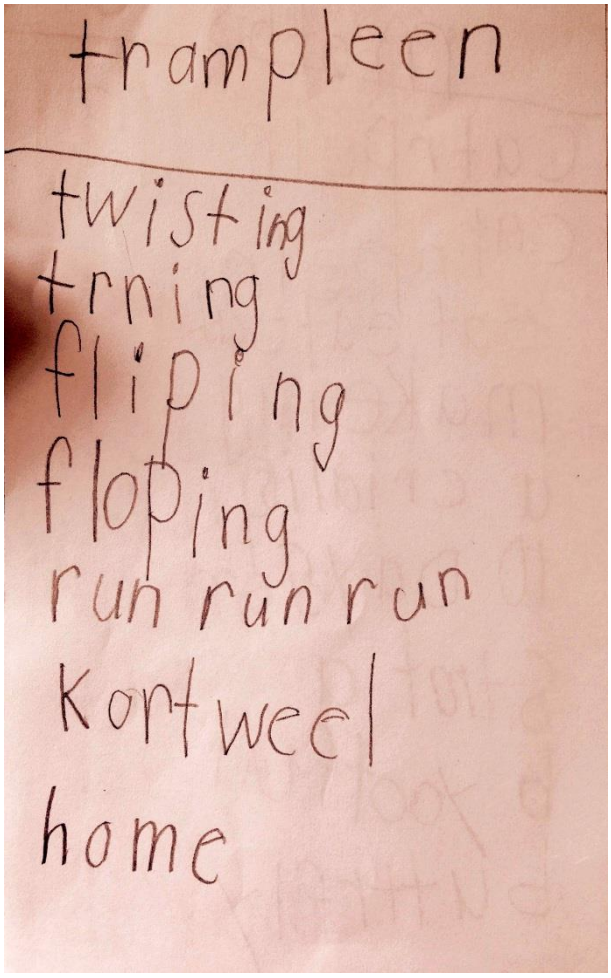

Lisa Singh (5 years):

Rhea Singh-7 years

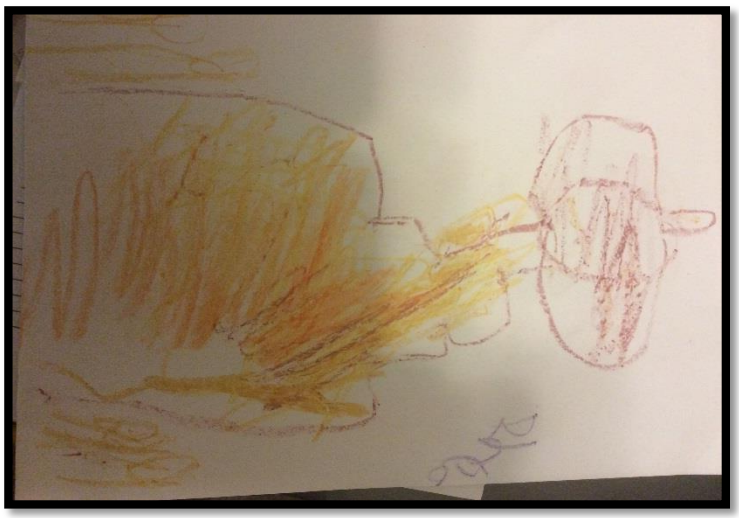

Banshika Mangal (10 years)

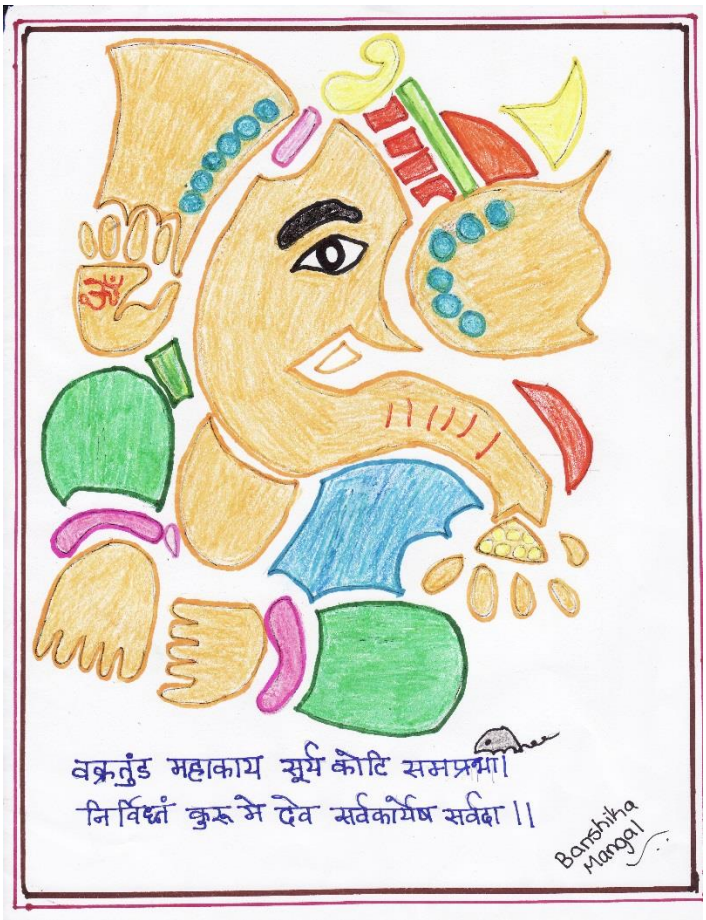

Blue Bells High School: My school experience in India!

Sriram B. Chakravadhanula

My 'India Trip' this summer was different from the ones I had all these years. I visited my maternal and paternal grandparents as usual, but also had some other exciting things that I did this year. Amma sent us to an 'Indian' school for almost a month. She said it would make us feel just like it did in her childhood. It is different from the school we attend here in the United States.

I was not very happy at the idea at first, as I heard that teachers spank/beat the students in an Indian school if they don't finish their work in time and also for many other simple reasons. I was very nervous for this reason. Also Amma told me that there would be language classes. I know a little bit of Telugu (my mother tongue) and Sanskrit that I have been learning at home. But it will be different in a school. I did not know how I will understand all that. I have also seen my cousins carry lots of books every day to school and struggle with tons of homework in the evenings. They hardly have any time to play. I was scared that my summer vacation will be very very busy!

But I was also excited at the same time for other reasons. That is because; we have to wear uniforms to school. One set of uniform for the entire week. Another set (a different color) for Saturday. Amma bought us black shoes and polish from a shop called 'BATA'. She said it is a popular shoe store in India. We would dress up to school in our uniforms and black shoes. I loved to polish my shoes every morning. I wish there were uniforms here!

The first day of school was very exciting. Morning Prayer started at 8-50 AM. Then we said the 'Indian Pledge'. Then we all went to our classes. Students from high school get to monitor the younger students during different activities at school. There was a big black chalk board at the school gate. A 10th grade student writes down a quotation on it every day for everyone to read. There is also a quiz question for students to answer. The name of the person who answers this question gets written on this board. This was my everyday challenge!

My class room experience was very nice. In America we do not have project work. There, we were given a project almost every two days and doing them was lots of fun. I send Amma to the color Xerox shop and stationery shop almost every day to gather stuff for my project! I loved the projects in Social Studies and Science. I used the 'political' and 'physical' maps of India, different kinds of charts to do my project work. I also learnt to draw diagrams in science projects. I got my own geometry box and got to use a compass to draw circles and arcs. Maths was so interesting!

The Unit Test (or UT) examination was very different from the exams I wrote in the US. These needed long study hours the day before, for preparation of each exam. This is my first year learning Hindi. This was my biggest challenge of all! I took a week off from school to visit my grandparents in the country side. This was the time I used to study only for Hindi exam. The

teacher used to explain the entire lesson in Hindi, and I couldn't understand a single word. I almost cried one day trying to remember the question-answers given for homework! But, my friends were very helpful in writing down the notes for me during class. I did well on all the exams, and much better than I thought on the Hindi exam.

I liked the atmosphere, friendly attitude of students and teachers and discipline in school there. Only one thing that really bothered me was sports. There wasn't really space for us to play in the school. There was no playground. I visited Amma's school and was surprised to find a huge playground. It seems that they have money to manage it. But these days due to so much construction around, some schools cannot afford playgrounds. They have to actually go to a different place to conduct their annual sports day meet. That felt very bad.

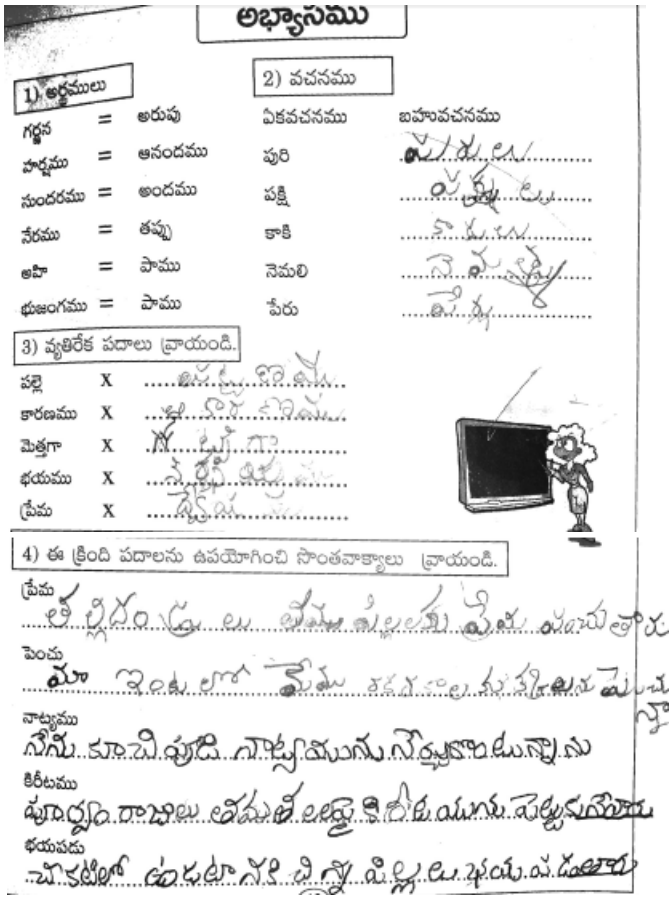

Images from my Telugu classwork!

I made new friends in my class- some naughty ones! And some really good ones! We even tried to have a play date. I had a really memorable trip this time.

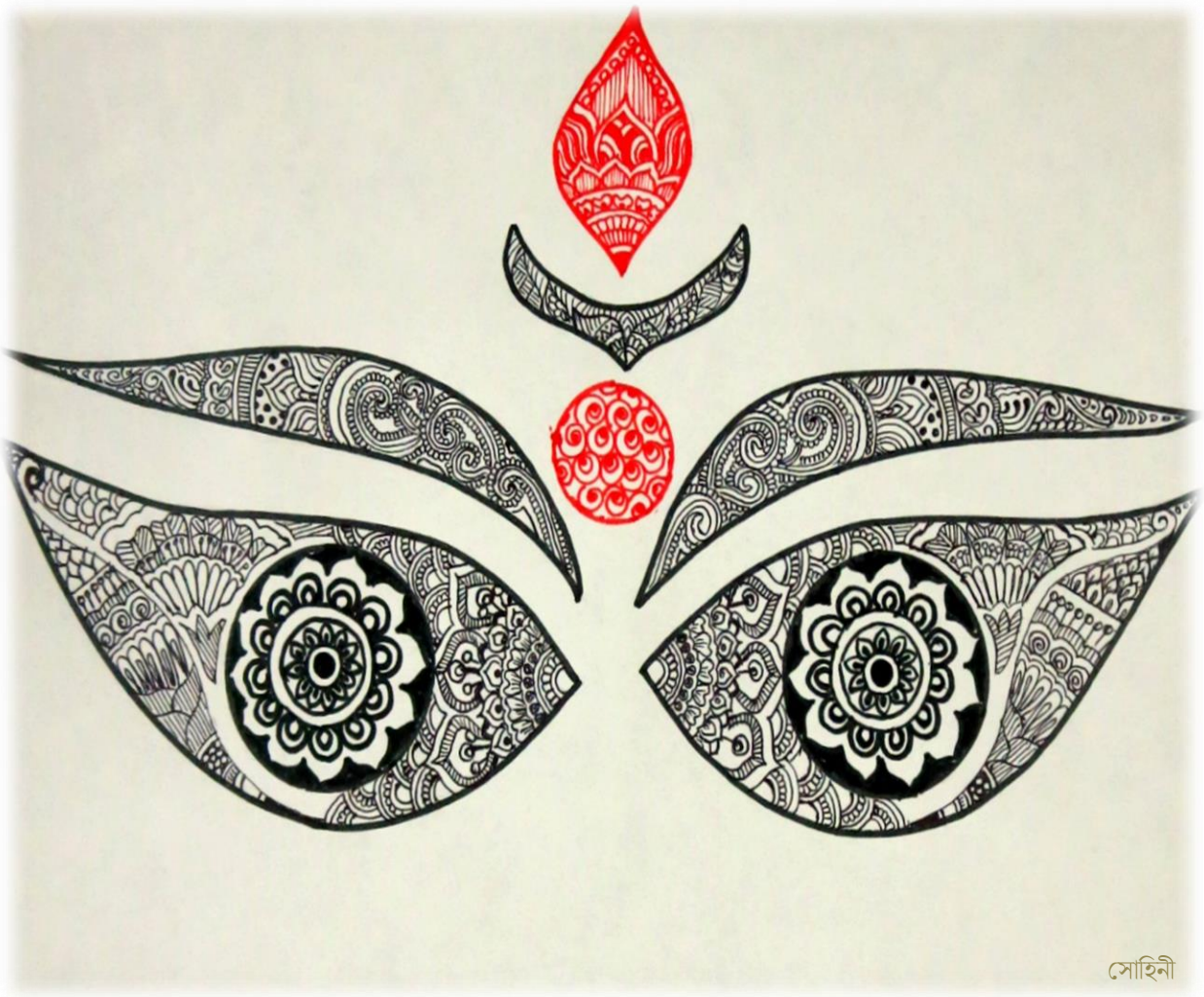
সোহিনী

যদি কিছু দিতে চাও

ব্রততী মজুমদার

যদি কিছু দিতে চাও,
দিও তবে উন্মুক্ত আকাশ।
যেখানে এ মন পাবে
ডানা মেলে ওড়ার অবকাশ।

যদি কিছু দিতে চাও,
দিও তবে কিছু নীরবতা।
প্রতিটি মুহূর্তে তার
সমর্পিতে পারি যেন
মনের সকল চঞ্চলতা।

যদি কিছু দিতে চাও,
দিও তবে দৃষ্টির আশ্বাস।
গভীরতা তার প্রতি পদক্ষেপে
ভরে দেবে অটুট বিশ্বাস।

যদি কিছু দিতে চাও,
দিও তবে আলোকিত এক মন।
যে আলোয় হবে উদ্ভাসিত,
নিশাসম আঁধার জীবন।

এলোনা

গঙ্গোত্রী সরকার

এলোনা..
লিখতে বসে কোনো কথাই
আর এলো না,
এলোনা ফুল ঝিরঝিরানো মাস,
এলোনা বসন্ত বিলাস,
অন্তমিলের সুর এলোনা কোনো,
এলোনা সেই নদীর মতন ভাব,
এলোনা..
লিখতে বসে কোনো লেখাই
আর লিখিনি,
একটা শুধু লিখেছি আক্ষেপ,
তারাও কি সব গেছে যেদিন
তোমায় বিদায় দিয়ে
উঠে এলাম সেই সিঁড়িটা বেয়ে?

আগন্তুক

সুরমা দাশ

তুমি আমায় বাসবে ভালো, কিসের জোরে!
আমিতো তোমায় কখনো দেইনি অনুমতি।
পরখ করে দেখবো তোমায়
দেখবো তোমার মনে,
ভ্রমরের মতো গুন গুনিয়ে
উড়ে বসো কোন কাননে।

দেখবো তোমার দুটি চোখে কোন সে ভাষা বলে,
জানবো আমার শান্ত মনটি, সেথায় কি হারায়।
ভালবাসা কি ভোরের বেলার
ফুর ফুরে শীতল হাওয়া,
নাকি জ্বলন্ত তুষের আগুনে
দুটি হাত ভরে দেওয়া।

রেখোনা তোমার পরিচয় গোপন করে,
চাইনা ছুটিতে মরীচিকার পেছনে আমি,
তোমার আকাশ তোমার গর্জন
তোমার বাদলা হাওয়া
করবেনা তো জীবন মাঝে,
কালো মেঘের কালো ছাওয়া।

কখনো তুমি সামনে থাকো কখনো বৃন্দাবনে,
তুমি যে ভালোবাসো থাকিতে রঙিন ফুলের কাননে।
স্নিগ্ধ শান্ত ঘরের ছাও
আমি যে বড় ভালোবাসি,
যেখানে জানালার ধারে উঁকি মারে
সূর্যমুখীর মিষ্টি হাসি।

আমি ভালোবাসি পাখির কূজন ঐ বন মাঝে,
সে যে উঁকি মেরে দেখে আমায়, বসে শিরীষ ডালে।
নেই যে তাদের কোনো চাওয়া,
না আছে পাওয়া আমার কাছে,
দখিনা হাওয়ায় তাদের ভাষায়
আবেগ যে ভরে আছে।

উঁচু পাহাড়ের শিখরে, কখনো নদীর স্রোতের দ্রুতগতিতে,
আমার মন যে ছুঁয়ে যায় সেথায়, আলতো করে।
কিন্তু উড়েনা আমার কেশ,
ভিজে যায়না আমার বস্ত্র,
ধূলার ধূসরে হারিয়ে যেতে
আমি যে ভীত সন্তস্ত্র।

তোমার ভাবনা মিলবে কি আমার ভাবনার সাথে,

তোমার বিচলিতায় আমি যে আতংকিত।

তুমি যে দমকা হাওয়া

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মতো,

তোমার ছোঁয়ায় হয় যে ভস্ম

কোমল ফুল অবিরত।

অবুঝ মনের ভালোবাসা যায় যে তোমার পিছে পিছে,

নেই যে তাদের সময় নিজেকে প্রশ্ন করার।

ছুটে যায় তারা দিশেহারার মত

তোমায় ভালোবেসে,

ঠকাও তুমি নিত্য তাদের

নতুন যুগের ছদ্মবেশে।

উতাল পাতাল ঢেউ বয়ে যায় যখন কারো মনে,

সেই ক্ষণেই তুমি বন্দি করে নাও তাকে, নিজের করে।

হয়তো কেউ পার হয়ে যায়

সেই অজানা ঢেউ খানি,

আবার কেউ হারিয়ে যায় সেথায়

শুনে তোমার মিষ্টি বাণী।

করো তুমি ছল এই পৃথিবীর দুর্বল মানুষের সাথে,

যাদের জানা নেই কোনো প্রতিবাদের ভাষা।

কখনো পরে যায় কেউ মুখ থুবড়ে

এই বিচিত্র ধরণীতলে,

কখনো হয়ে যায় কেউ ভস্ম

বিরহের আগুনে জ্বলে।

করোনা ধাওয়া আমার পিছে পিছে

আমি যে নবীনা, সাহসী, কিন্তু শান্ত মনুষী,

চাইনা আমি কলুষিত করতে

আমার ভালবাসাকে,

সে যে অমূল্য রত্ন

সযত্নে রয়েছে আমার বুকে।

আত্মপরিচয়

সন্ধ্যা মজুমদার

মাঝে মাঝে আমি চার্চে যাই

কেননা ভালো লাগে বাইবেল পড়তে

আমি খ্রিষ্টান নই, ঘন্টার মধুর ধ্বনি শুনে

মন চায় ওখানে ছুটে যেতে।

নামাজের সুর শুনে মসজিদে

চলে গেছি অনেকবার

মুসলিম,পারশী, বৌদ্ধ, জৈন বা খ্রিষ্টান

কোনো ধর্ম নেই আমার।

পূর্ব না পশ্চিম কোথা হতে

আমার আগমন কে জানে?

ভূমি, বায়ু, আকাশ সবার দূর্বার আকর্ষণ

আমাকে বারবার টানে।

আমি হিন্দু নই, তবুও মন্দিরে প্রদীপ জ্বালি,

বেদের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে

সাজাই ফুলের ডালি।

তন্ত্র ,মন্ত্র , সাধনায় নয় আমার বাস

কোনো ধার্মিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে নেই মোর বিশ্বাস।

পঞ্চতত্বের কোনো অংশ নেই আমার শরীরে

তবুও আমার প্রভাব জড়িয়ে আছে এ জগৎ সংসারে।

আমার কোনো রূপ নেই, আকার নেই, আমি নিরাকার

কিন্তু আমি যে লুকিয়ে আছি ,সবার মনের ভিতর।

আমার সৃষ্টি আছে অথচ কখনও হবেনা বিনাশ

এ ধরার প্রতিটি কণার মাঝে লেখা আছে আমার ইতিহাস।

আমি কোনো গল্প ,কবিতা বা উপন্যাসের অংশ নই

আমি লুকিয়ে থাকি নিজের মাঝে

আমার নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই।

সমগ্র পৃথিবীটাকে আমার নিজের মনে হয়

শত্রুতা ,বিদ্বেষ ,পাপ সব ধুয়ে যায় আমার ছায়ায়।

পূরব হতে পশ্চিম আমার স্পর্শে সারা জগৎ হয় যে উজ্জ্বল

দুখের ভব সাগর পার হবে যদি কর আমারে সম্বল।

আমি চঞ্চল আমি উচ্ছল ,প্রগতিশীল আমি অবিনশ্বর

আমি মনুষ্যত্ব ,মানবতা,মমতা, দাতা

আমি যে ঈশ্বর।

রবি ঠাকুর, পূজোর গান এবং গানের পূজা

অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি
পূজার সময় এল কাছে
মধু-বিধু দুই ভাই ছুটা-ছুটি করে তাই
আনন্দে দুহাত তুলে নাচে।

মধু আর বিধু দুই ভাইকে নিয়ে কবিতাটা হয়ত অনেকেই পড়েছেন। পূজোর আগে তাদের গরিব বাবা অনেক কষ্ট করে তাদের জন্য ধুতি-চাদর এনেছিলেন, বিধু তা সানন্দে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধু তা রাগে-দুঃখে ছুঁড়ে ফেলেছিল। শেষ অবধি ধনী বন্ধুর সাটিনের জামা গায়ে দিয়ে তার শখ মেটে। আজকের সুপার মল-কালচারের সন্তান সন্ততিরা কার সঙ্গে একাত্ম বোধ করবে জানি না, কিন্তু প্রথমবার কবিতাটি শুনে আমাদের চোখে জল এসেছিল, বিধুর জন্যে গর্বে ভরে উঠেছিল বুক। তা ছাড়া কবিতাটি কার জানতে চেয়েছিলাম এবং এই ভাবেই রবি ঠাকুরের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে যায়। তার আগে অবধি আমাদের বসার ঘরে পাকা গোঁফ-দাড়িওয়ালা সুন্দর মানুষটির ছবি দেখে ভাবতাম, সত্যি সত্যি কোনো ঠাকুরই হবেন বুঝি। কার্তিক ঠাকুর, বিশ্বকর্মা ঠাকুর, রবি ঠাকুর। রবি ঠাকুর না কবি ঠাকুর, বাঃ। তৃতীয় শ্রেণীতে এরকম যে কত অজানার আনন্দ জুটে যায় পদে পদে।

যেদিকে তাকাই সোনার আলোয় দেখি যে ছুটির ছবি
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই পূজার দিনের রবি।

কবিতাটা পাঠ্য ছিল, পরীক্ষার খাতায় জবরদস্তি লিখতে হত, শরতের অমল মহিমার কথা, ভাষার উচ্ছ্বাসে, যাকে বলে ফেনিয়ে তোলা ভাব সম্প্রসারণ। আমার কোনও গ্রামীণ শিকড় নেই, কাশফুল আর পদ্ম-বিল দেখেছি ট্রেনে যেতে যেতে। ঘটি-প্রধান শহরে জন্ম কর্ম এক জন্ম সূত্রে কাঠ-বাঙালের। লিখব কি, বকুল কখন ফোটে, কখন শিউলি, তাই জানি না ঠিক করে। সেই যে গান আছে না, যে দিন ফুটল কমল? অথচ বাংলার স্যার আবার গ্রামীণ জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। জানি না, দেখিনি এসব বললে তাঁর ঠোঁট যাবে বেঁকে, 'অ্যাঁ, বড় শউরে ছেলে এয়েছেন'। ভুল ভাল লিখলে বলবেন, 'ধান গাছে তক্তা হয়?' অগত্যা আমার গতি সেই একই ঠাকুর। গানের ইশকুলে শেখা গান থেকে দিলাম ঝেড়ে টুকে, 'ওগো শেফালী বনের মনের কামনা', এবং বাংলায় ৭০, জীবনে প্রথম।

ভেবেছিলাম এই অন্ধত্ব নিয়ে, না দেখা নিয়েই কেটে যাবে বাকি জীবন। তারপর একদিন এই সুদূর প্রবাসের বাসার জানালা থেকে পওয়াই লেক দেখতে দেখতে ঠিক টের পেয়ে গেলাম শরতের সোনালী আলোর সেই অচিন্তনীয় লীলা। সত্যিই তো, ঠাকুর ছাড়া কে চিনত, কে চেনাতো অচিন্ত্য?

কে রয় ভুলে তোমার মোহন রূপে'?

এই গানটা খুব বিভ্রান্ত করে দিত আমাকে। মোহন রূপ দেখলে তো আমরা ভুলবই (যেমন ভারতীয় শিল্পপতির বাড়ীতে হেলিপ্যাড হচ্ছে শুনলে ভাবি, তাই তো, আমাদের দেশের বড় উন্নতি হচ্ছে), তার পিছনে আবার কোন মরণের নৃত্যের কথা বলা হচ্ছে? একটু বড় হতে বুঝলাম বঙ্কিম যাদের কথা বলেছেন, সেই চিরদিনের হাশিম শেখ, রামা কৈবর্তরা বছরের এই সময়টায় পুত্র-পরিজনের হাত ধরে নেমে আসে রাস্তায়। ভাতের ফ্যান ভিক্ষা করে খেয়ে, অন্যদের ছেঁড়া–বাতিল কাপড়-জামা পরে কাটিয়ে দেয় কটা দিন। বন্যা ও তৎপর-বর্তী মহামারীতে বিপর্যস্ত উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের এই মানুষগুলি জেলায় জেলায় এই মৃত্যুর নাচ দেখে আসছেন জন্ম–জন্মান্তর ধরে। ভরা ফসলের খেতে তাই তরাস তো লাগবেই।

তবে মিছে সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গলকলস

আটাত্তর সালের পূজায় আমাদের কোনও নতুন জামা হয় নি। সে বছরের ভয়ঙ্কর বন্যার লোলজিহ্বা আমাদের জেলার শতকরা ৬০ ভাগ গ্রাস করেছিল, যা প্রায় নজিরবিহীন। আমাদের শহরের এক অদ্ভুত থমথমে অবস্থা। চাল-ডাল, গ্যাসের উনুন, বই-খাতা, কাপড়-জামা সব অর্ধসমাপ্ত দোতালায় তুলে রাখা হয়েছে, যদি শহরে জল ঢোকে রাতের অন্ধকারে। বাবা-কাকারা চিন্তিত মুখে রেডিওর বুলেটিন শুনছেন ঘন ঘন। মাঝে মাঝে উড়ো খবর আসছে দামোদরের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে চন্দননগরে। এইভাবেই কেটে গেল মহালয়া অবধি। তার পরের দিন থেকে জল নামতে শুরু করল। এবং শুরু হল পূজোর তোড়জোড়। কাগজে ঘোর বিতর্ক, এ রকম অবস্থায় কি পূজার আড়ম্বর বর্জন করাই শ্রেয় নয়? বাবার ইচ্ছে, চ্যারিটিতে টাকা দিয়ে দেবার। মা একদম পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়ার পক্ষপাতী নন। কিন্তু আমার হাতে তখন রবিঠাকুরের কবিতাটি সদ্য এসেছে। আদর্শবাদে আক্রান্ত 'স্কুলের ছাত্র' কবিতাটি হাতে নিয়ে এমন জোরালো সওয়াল করল, সত্যিই সে বছর কোনও জামা কাপড় জুটল না, উপরন্তু তার পর থেকে আমরা কেউ কোথাও কোনও বন্যার খবর পাই বা না পাই, একজন ভদ্রলোক প্রতি বছর পূজোর চাঁদার মত বন্যাত্রাণের চাঁদা নিতে আসতে লাগলেন, এমনই তাঁর জনসেবায় আগ্রহ।

সে বছর মা দুর্গার আমাদের মতই দুরবস্থা। ভালো করে শুকোনোর আগেই মাটিতে রঙ করতে হয়েছে, অঞ্জলি-দাতাদের পই পই করে বলে দেওয়া হচ্ছে, প্রতিমা কাঁচা থাকতে পারে, কেউ প্রতিমা তাক করে ফুল ছুঁড়বেন না। প্যান্ডেলে দেখা যাচ্ছে শুধু আমরা এবং মা দুর্গা খালি পায়ে। শুধু আমাদেরই জুতো জামা হয় নি। ভাই বাড়ীতে এসে তুলকালাম করে দিল। শুধু আমি আর আমার বাবা একলা। সে বছরের দীপাবলিতে আমাদের কৃচ্ছসাধনের অবসান হয়।

যাই হোক, যা বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে অসাম্যের কথা, আড়ম্বরের অপ্রয়োজনীয়তার কথা, সবার যোগদান ব্যতিরেকে উৎসবের অচরিতার্থতার কথা বলা হয়েছে, সেসব অন্যায়ের প্রতিকার শুধু একবারের পূজোর জামা কাপড় ত্যাগ করে করা যায় না, এ কথা আজ আমি জানি। কারণ সে সব সমস্যার মূল আরও অনেক গভীরে, তার ক্ষত আরও সুদূরপ্রসারী। ভোগবাদ শুধু টাকা পয়সার অন্ধ-তৃষ্ণাই বাড়ায় না, আমাদের বাধ্য করে এই মারণ চক্রের অংশীদার হয়ে যেতে। আজকের পৃথিবীর এই জ্বালানী সঙ্কটের, পরিবেশের সঙ্কটের মূলেই রয়েছে এই ভোগতৃষ্ণা। যে সম্ভার পৃথিবী চারশো ষাট কোটি বছর ধরে তৈরি করেছে, পাঁচ-দশ হাজার বছরের মানব সভ্যতাই তা ছারখার করতে যথেষ্ট।

রবি ঠাকুর আমার জন্য, আমার মত অনেক অন্ধ মানুষের জন্য এরকম সঙ্কেত রেখে গেছেন তাঁর লেখার জায়গায় জায়গায়। সেই প্রাসঙ্গিকতার জন্যই আমার পূজার ভুবন ভরে রইল তাঁর গানে।

চির-কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনি।।

9-11 **(September 11th)**

গৌতম সরকার

এটা নেহাতই একটা গল্প, কারোর ‘হাঁড়ির-খবর’ নয়।

আমার বৌ লিন্ডা কাজে বেড়ানোর আগে আমাকে কয়েকটা ঠেলা মেরে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়ে গেলো। বলে গেলো যে ও বেরচ্ছে, আমি যেন ভেতর থেকে দরজার ‘চাইল্ড-সেফটি-ল্যাচ’-টা ঠিকঠাক লাগিয়ে দি। আড়মোড়া ভেঙ্গে আমি একবার খাটের পাশের অ্যালার্ম-ক্লকটার দিকে তাকিয়ে নিলাম, সকাল সারে-ছটা। মেয়ে তিনটের দিকেও একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ওরা সকলেই ঘুমে কাদা। একদিকে চার বছরের গ্রেস আর তিন বছরের মায়া জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, অন্যদিকে প্রায় এক বছরের কেইটি, দুই হাত নিতাই-গৌরাঙ্গের মত তুলে ঘুমাচ্ছে। মাঝখানে আমিই শুয়েছিলাম, চোখ কচলাতে কচলাতে সেখান থেকেই নামলাম, আমার শোওয়ার পাজামার কোমরের ইলাস্টিকটা ঠিক করতে করতে। অন্য দিন হলে ঘড়িটার দিকে এই সময় তাকানোর কোনও প্রয়োজনই হত না। কিন্তু আজ তো আমার তাড়া, আজ আমায় সকাল এগারোটায় নিউ-ইয়র্ক স্টেটের রচেস্টার শহরে যাবার প্লেন ধরতে হবে, ওখানকার ‘কোডাক’ কোম্পানিতে কাল সকালে একটা ইন্টারভিউ আছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সান-ফ্রান্সিস্কো থেকে আমি যাব ওয়াশিংটন ডি.সি.-র ডলাস এয়ারপোর্টে, সেখান থেকে নিউ-ইয়র্ক স্টেটের নিউ-ইয়র্ক শহরের জে.এফ.কে. এয়ারপোর্টে, আর তারপর সেখান থেকে রচেস্টারে।

বছর খানেক আগেও এই সময়টা ছিল একান্তই আমাদের, মেয়েরা ঘুমাচ্ছে বলে! দিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে তো একজনের আর একজনের দিকে তাকানোরই সময় হয় না; ডে-কেয়ার থেকে তুলে তিন মেয়েকে চান করানো, তাদের বায়নাক্কা সামলানো, সাপার বানানো, আর তারপর তাদের খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে কোন রকমে হয়ত একটু টিভি দেখা আর তারপর নিজেদের শুতে যাওয়া। তাছাড়া প্রায়ই আমাদের দুজনেরই কিছু না কিছু কাজ অফিস থেকে বাড়ি বয়ে নিয়ে আসতে হয়, যেমন আমার ‘খাতা-দেখা’, ওর ‘জার্নাল-পড়া’ ইত্যাদি। সেইসব রাতে টিভি দেখাটাও লাটে! তাই দিনের শুরুটাতেই যা সম্ভব, মেয়েরা যখন ঘুমাচ্ছে! কিন্তু আজকাল সেসব চুলোয় গেছে। এই তো, মাস কয়েক আগেও আমাকে ‘হাগ’ না কোরে ও কাজে বেরত না। কিন্তু সেসব অনেক দিন আগেই চুকে-বুকে গেছে। এখন আমাদের সম্পর্কটা এই ঠেলায় এসেই ঠেকেছে; সকালে কয়েকটা গুঁতো, নতুবা সন্ধেবেলা ‘ডিনার-টেবিলে’ “উড ইউ পাস মি দা ফুড প্লিজ?”। ব্যাস।

গ্রেস আর মায়াকে আজকাল চোখে চোখে রাখতে হয়, না হলে দরজা খোলার সুযোগ পেলেই ওরা বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়, সামনের বাগানটায়। শুধু বাগানে হলে অত চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু বাগানের পরেই যে রাস্তা, ‘বাওয়ার্স অ্যাভিনিউ’, সেখানে গাড়িঘোড়া; বাগানের গোলাপ-গাছ-গুলোতেও অনেক কাঁটা। এই চিন্তাগুলো না থাকলে ও হয়ত আমাকে আর গুঁতোটাও মারত না। হাই তুলতে তুলতে ওর পেছন পেছন গেলাম, দরজায় খিল দেব বলে। ওকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম যে আজ বিকেলে-তো আর আমি থাকব না, ও যেন মেয়েদের ডে-কেয়ার থেকে সময়মত তুলে নেয়। কাল আমার ফিরতে ফিরতেও তো সেই সন্ধ্যে, ঠিকঠাক যেন সব ‘ম্যানেজ’ করে নেয়। শুনতে পেল কি পেলোনা তা ঠিক বুঝলাম না, না কি হয়ত গা-ই করল না; কারণ ও ফিরেও তাকাল না। বেড-রুমের কার্পেট পেরিয়ে, লিভিং-রুমের হার্ড-উড ফ্লোরে হাই-হীল জুতোয় টক্ টক্ আওয়াজ তুলে, গট গট করে হেঁটে ও বেড়িয়ে গেল গ্যারাজের উদ্দেশ্যে। বড্ড কানে লাগল আওয়াজটা। ফ্লোর তো নয়, যেন আমার মাথার ওপরেই কয়েকটা বাড়ি মেরে গেল ওর জুতোর ঐ হীল-দুটো দিয়ে!

এই তো হয়েছে আজকাল আমাদের রুটিন। ও খুব সকালেই কাজে বেরিয়ে যায়। ওকে যেতে হয় সেই সান-ফ্রান্সিস্কো এয়ারপোর্টের পাশে, বার্লিঙগেমে। ওখানেই ওর অফিস। সকাল সকাল না বেরলে ‘রাশ আওয়ারে’ এতো ট্র্যাফিক-জ্যাম হয় ওদিকটায় যে আট লেনের ফ্রি-ওয়েতেও গাড়ি থৈ থৈ; আমাদের সান্টা-ক্লারার বাড়ি থেকে তিরিশ মিনিটের পথ যেতেই দেড় ঘন্টা লেগে যায়। একটু সকাল সকাল বেরোলে ‘সেই ট্র্যাফিকটা’কে এড়ানো যায়। আমার সেই চিন্তা নেই। আমার কাজ কাছেই, উল্টোদিকে সান-হোসেতে। ওখানেই এক ইউনিভার্সিটিতে

পড়াই আমি। আমার জার্নি ট্র্যাফিক জ্যামের উল্টো মুখে বলে কাজে যেতে বিশেষ সময় লাগে না। তাই সকালে লিন্ডা আগে আগে বেরোয়। পরে আমি বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে, ব্রেকফাস্ট খাইয়ে, রেডি করে, ডে-কেয়ারে নামিয়ে তারপর কাজে যাই। দিনের শেষে ট্র্যাফিক জ্যামের ব্যাপারটা আবার ঠিক উল্টো বলে লিন্ডাই কাজ থেকে ফেরার পথে মেয়েদের ডে-কেয়ার থেকে তুলে বাড়ি আনে। এতে ডে-কেয়ারের কস্টে একটু সাশ্রয় হয়। আর আমি সারাদিন ছাত্র-ছাত্রী 'ঠ্যাঙ্গানর' পর সন্ধেবেলার রাশ আওয়ারের ট্র্যাফিক-জ্যাম 'ঠেঙিয়ে' সরাসরি বাড়ি ফিরি, বেশ সময় লাগে।

কিন্তু আজকাল আর বাড়ি ফিরতে তেমন ইচ্ছা করে না, সঙ্কোচ হয়। বাড়ি ফিরলেই তো নানান অভিযোগ। তার সাথে সিগারেটের ধোঁয়া, মদের গন্ধ, নানান রকম ওষুধ-বিসুধ···এইসব মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়েই চলেছে। এগুলো আগেও ছিল, তবে বাড়াবাড়িটা শুরু হয়েছে প্রায় বছর-খানেক হোল; আমি আগে যেখানে কাজ করতাম, সেই 'অক্সফোর্ড মলিকুলার' কোম্পানি লাটে ওঠার পর থেকেই, যখন 'সিলিকন ভ্যালি'র 'বাব্ল-বার্স্টে' আমার কোম্পানিও সামিল হল। এমনিতে আমার এই পড়ানোর চাকরীটা খারাপ লাগছে না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে এটা লিন্ডার ঠিক পছন্দ নয়। আমার ইউনিভার্সিটির মাইনেটা নাকি ঠিক আমার যোগ্যতা অনুযায়ী যথেষ্ট নয়, লিন্ডার আশানুরূপও নয়। তা ঠিক, এই চাকরীর মাইনেটা আমার আগের চাকরীর তুলনায় সত্যিই অনেক কম, লিন্ডার চাকরীটা না থাকলে আমাদের এই ঠাটবাট বজায় রাখার কোন প্রশ্নই উঠত না। অথচ পরিবারটাকে মিনেসোটা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় এনেছিলাম তো আমিই, আমার আগের চাকরীটার ওপর নির্ভর করেই। তখন আমার রমরমা ছিল, আমার কাজের ভরসাতেই ও ওর মিনেসোটার 'ল্যাব-ম্যানেজারের' চাকরীটা ছেড়ে আমার কাছে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে এসেছিল। শুধু আমার চাকরীতেই সান-ফ্রান্সিস্কোর মত জায়গায় 'মুভ' করার ৬ মাসের মধ্যেই আমরা একটা 'সিঙ্গিল-ফ্যামিলি' বাড়ি কিনতে সক্ষম হয়েছিলাম। মিনেসোটায় ওর পরিবারের অনেকেই এসব দেখে একেবারে 'হাঁ' হয়ে গিয়েছিল। মুখে কিছু না বললেও ও যে এসব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে তা আমি বুঝতে পারতাম। হপ্তা-অন্তর ওর হেয়ার-ডু পাল্টান আর পেডিকিওর-ফেসিয়ালে তার একটা বহিঃপ্রকাশও ছিল। আমার বৌয়ের মুখের চামড়ায় একটা জেল্লা এসেছে, দেখে আমারও ভালো লাগত বৈ কি! আমার শুধু একটাই আক্ষেপ ছিল; বাবাটা বেঁচে থাকতে থাকতে এসব হলে কি ভালোই যে হত! কিন্তু সে দিন আর বেশিদিন টিকল না। 'অক্সফোর্ড মলিকুলার' কোম্পানির সাথেই কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

এখন লিন্ডার কাজ না করলেই নয়, বাড়ির 'মর্টগেজ', গাড়ি দুটোর 'পেইমেন্টস', আনুষঙ্গিক ইনস্যুরেন্স কস্টস, আমাদের লাইফ-ইনস্যুরেন্স, হেলথ-ইনস্যুরেন্স, পারিবারিক অন্যান্য খরচ-খরচান্ত - এইসব তো আর উবে যাবে না। আর উঠতে বসতে এই ব্যাপারেই কথা শোনায় ও আমাকে আজকাল। ওর ধারনা যে আমি ওর ঘাড়ে এসে জুটেছি; ওর ঘাড়ে বসে ওর পয়সাতেই খাচ্ছি, ওর পয়সাতেই গিলছি। আমার পরিবারকে ফোন করে আমি নাকি 'ইন্টারন্যাশনাল লং-ডিষ্টেন্সে' একটু বেশীক্ষণ ধরে কথা বলি, তাতে অনেক খরচ। সে খরচ যোগাবার মুরদ আছে আমার? আর তাঁদেরকে ফোন করাই বা কেন? তারা কি কোনদিন একটা বার্থ-ডে কার্ডও পাঠিয়েছে আমাদের মেয়েদের? তাছাড়া আমাদের বিয়েতে বাধা দিয়ে ওঁরা যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন, সেগুলো কি এতো সহজেই ভুলে যাবে ও? 'Holy cow'-এর ব্যাপারটাতো ও আগে থেকেই জানত, আর তারপর ভারতে গিয়েও তো স্বচক্ষে দেখেই এসেছে যে কোন জায়গার 'মাল' আমি, কোলকাতার রাস্তায় ঘেয়ো-কুকুর আর বহরমপুরের রাস্তায় ড্রেনের-খিঁচ মাখা শুয়োর, টয়লেট-পেপার 'খায় না মাথায় দেয়?', কাজের লোক ঘর-বাড়ি ঝাঁট দিয়ে নোংরা ফেলে রাস্তায় আবার সেই নোংরাই হাওয়ায় উড়ে এসে ঢোকে ঘরে! আমার সব কিছুই নাকি একটা 'ইভিল-সাইকেল'। এইসব আগে জানলে.....। কী বা আর আশা করা যায় আমার কাছ থেকে? গাধাকে পিটিয়ে কি আর ঘোড়া বানানো যায়? আমার 'পেরেন্টিং-স্টাইল'ও নাকি ঠিক না, আমি নাকি 'ইনকনসিসটেন্ট'; এতে মেয়েদের ক্ষতি হচ্ছে। নিজেদের ঘর-বিছানা থাকতে বাপ-মায়ের খাটে এসে শোবে কেন ওরা? এতে নাকি 'আমাদের প্রাইভেসি' থাকছে না, আর ওদেরও অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন থেকেই না শিখলে অন্যের প্রাইভেসিকে 'রেস্পেক্ট' করা, স্বনির্ভরতা এইসব শিখবে কি করে ওরা? মায়ের সাথে এক খাটে শুয়ে বড় হয়েই তো আমার নাকি এই অবস্থা; ওকে ছাড়া আমার চলেই না, ঐ জন্য ওর পেছনে সর্বদা ঘুরঘুর করি আমি, আমি নাকি ওর ওপর 'ইমোশনালি-ডিপেনডেন্ট'। আমাদের মেয়েদের ক্ষেত্রেও এটা ঘটুক তা একেবারেই চায় না ও। আমি বললাম রাখো তোমার ঐ 'স্বনির্ভরতা'; দেখতেই তো পাচ্ছি চারদিকে, grade-9, 10 থেকেই বাচ্চাগুলো সব পকেটে কনডম নিয়ে ঘুরে বেড়ায় - দেখলেই মনে হয় যে এক রদ্দায় মাথাটা ঘাড় থেকে আলাদা করে দি; দরকার নেই আমার ঐ ঘোড়ার-ডিমের 'স্বনির্ভরতা'। রদ্দাটা যেন ওর ঘাড়ে গিয়েই পড়ল, কারণ কথাটা শুনে ও যেন একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল! এর

ওপর যোগ হয়েছে হঠাৎ আমার এই ভারতীয়-বাঙালি হবার বাসনা, এই সান-ফ্রান্সিস্কোয় আসার পর থেকে। এখানকার ভারতীয় দোকানপাট দেখে আমার নাকি মাথা ঘুরে গেছে! এইসব অপ্রয়োজনীয় ভারতীয় খাবার-দাবার কেনা, মেয়েদের অপ্রয়োজনীয় ভারতীয় জামাকাপড় কিনে দেওয়া, এইসবের একটা 'এক্সট্রা' খরচ নেই? তা যোগাবে কে? সংসারের খরচ চালানোর পর হাতে আর আমাদের থাকে কিছু? এইসব আমি জানি না? তারও ওপর আমি নাকি ওর স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করছি; ও কত 'ড্রিঙ্ক' বা 'স্মোক' করবে, সেইসবে আমি বাধা দেবার কে? নিজে তো 'সোশালাইজ' করতে জানিই না, উল্টে ওর 'সোশালাইজেশনে'ও আমি বাধা দেবার কে? আমার আবার 'সোশালাইজেশনে'র যা ছিরি; বাড়ি বয়ে লোক ডেকে এনে এক থালা ভাত খাওয়াও! তাদের নাকি কেউ হাঁ করে হাঁচে, কেউ হাঁ করে চিবোয়, কেউ বা আবার হাতে ভাতের দলা পাকিয়ে 'গোল্লা' করে মুখে ছোঁড়ে! দেখে নাকি ওর সারা শরীর রি-রি করে, গা-পিত্তি একেবারে জ্বলে যায়। ওর 'কমপ্লেইন্টসে'র লিস্টটা যেন আর শেষই হতে চায় না। মুস্কিল হল এই যে ওর বেশীর ভাগ 'কমপ্লেইন্টস' গুলোর মানেই আমি বুঝতে পারি না, তা সংশোধন করা তো দূরের কথা! শুধু বলেছিলাম যে মেয়েরা ওদের ঘরে একা একা শুতে ভয় পায়, ওরা শুগ না আরও কিছুদিন আমাদের বিছানায়, তারপর না হয়.....। সেটা ওর পছন্দ হল না। আমার মতন ওর তো আর 'সুখের চাকরী' না যে একই 'ফর্মুলা' আর 'ইকুয়েশন' বছর বছর পড়িয়ে যাওয়া, ওর 'বায়োটেক' – হপ্তা অন্তর 'নিউ-রিসার্চ ফাইন্ডিইংস' নিয়ে ওকে 'ডিল' করতে হয়; ওকে নাকি প্রতি মিনিটেই কনসেনট্রেট করতে হয়, সারাদিন কাজ করতে গেলে ওর নাকি রাত্তিরে ভালো ঘুমের দরকার, একটু 'পার্সোনাল স্পেস' দরকার!

অগত্যা আজকাল আলাদা হয়ে গেছি আমরা, এক ছাদের তলায় থেকেও। কবে যে শেষ আমরা এক খাটে শুয়েছি তা আর মনে করতে পারি না। আমাদের 'মাস্টার বেডরুমে'র বড় খাটটায় আমিই শুই, আমাদের তিন মেয়েকে নিয়ে, আর ও শোয় 'গেস্ট-রুমে'র 'স্পেয়ার-বেড'টায়। মেয়েদের ঘর, বিছানাগুলো সব খালিই পড়ে থাকে। ডিনার টেবিলেই একটু দেখা-সাক্ষাত বা কথাবার্তা হয় ওর সাথে, না হলে সেই ভোরবেলায় দরজায় খিল দিতে গিয়ে। ভাগ্যিস আমার হাতে রান্না করা 'ইন্ডিয়ান-ফুড' এখনও পছন্দ ওর! আজকাল আর কিছু বলতে সাহস পাই না, জানি তাতে ওর 'ড্রিঙ্কিঙে'র মাত্রাটা শুধুই বাড়বে। তাই চুপ করে থাকি। আমারইতো যত দোষ। ও তো আর আমার দেশে যায়নি, আমিই এসেছি ওর দেশে; আমারই নিজেকে পাল্টানো দরকার, ওর ভাব-ধারার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া দরকার। চেষ্টা তো করেই চলেছি, কিন্তু কিছুতেই যুঝে উঠতে পারছি না। তবুও সুযোগ পেলেই এই কথা-গুলো ও আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় একবার করে। কি হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না, এইসব আমি ছাড়া ওর থেকে ভালো আর কেউই জানে না, তবুও খোঁটাটাও আসে ওর কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি!

আরও আছে, মিনে-সোটায় ওর বাড়ির লোকজন। সুযোগ পেলেই তাঁরা আমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন যে আমি নাকি "did not mount up to potential"। বৌ বাড়ি বসে পায়ের ওপর পা তুলে খাবে, নিত্য হেয়ার-ডু পাল্টাবে, ম্যানিকিওর-পেডিকিওর আর ফেসিয়ালের ছড়াছড়ি থাকবে, হরদম গাড়ি পাল্টান হবে – এইসব না হলে কি আর একটা পি.এইচ.ডি.-হাসব্যান্ডের পোটেনশিয়ালে 'রিচ' করা হয়? এক এক সময় মনে হয় যে লিন্ডা আমাকে বিয়ে করেনি, ও বিয়ে করেছিল একটা ডক্টরেট-কেমিস্টের 'পোটেনশিয়াল' রোজগারকে; ওর পরিবার আদৌ মেনে নেয়নি তাঁদের সাদা মেয়ের এক ভারতীয়কে বিয়ে করা, তাঁরা শুধু মেনে নিয়েছিলেন এই যে সেই ভারতীয় হয়ত তার 'পি.এইচ.ডি.-ইন-কেমিস্ট্রি'-র ডিগ্রীটা আর রোজগার-পাতি দিয়ে তাঁদের পরিবারের অন্যান্যদের চুপ করিয়ে দেবে। সেইসব ঠিকঠাক না হওয়াতেই যত বিপত্তি। একবার কথায় কথায় বলেছিলাম যে আর কয়েকদিনের মধ্যে মনের মত একটা চাকরী না পেলে ডাক্তারি পড়ব ভাবছি, শুনে ও একেবারে ফোঁস করে উঠল। আরও একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম সেদিন, ওর কানে আমার শাশুড়ি-মার 'ফুসমন্তর'; আমি নাকি ওকে আর আমাদের তিন মেয়েকে ওর মিনে-সোটার পরিবারের থেকে অনেক দূরে রেখে ওদের 'আলাদা' করে দিতে চাইছি। তা না হলে কি দরকার আছে এই ক্যালিফোর্নিয়ায় পড়ে থাকার?

খুবই একা আর অসহায় লাগে, নিজেকে বড্ড ছোট মনে হয়; কিন্তু কি যে করবো তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এইসব নিয়ে কারও সাথে কথা বলে কন উপদেশ নেব কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না। বাড়িতে কারো সাথে এইসব ব্যাপারে কথা বলার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওরা বুঝবেও না, উপরন্তু ওঁদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেছিলাম বলে আমায় অন্যরকম খারাপ কিছুই বলবে, আমার সেটাই দৃঢ় বিশ্বাস। দু-একবার যে চেষ্টা করিনি তা নয়, কিন্তু মদ-মাতলামি এইসবকে ওরা 'নোংরামি' আখ্যা দিয়ে আলোচনাটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়; তাই দেশের

কারো সাথেই এই নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করে না - ওরা ঠিক বোঝে না। বন্ধু-বান্ধব যে দু-একজনের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলা যায় বলে আমার মনে হয়, তাদেরকেও বলব বলব করেও কিছু বলতে পারি না; লজ্জা, ভয়, অহংকার, সঙ্কোচ – সব একসাথে মনে এসে ভিড় করে। আবার মনে হয়, কেনই বা কষ্ট দেব নিজের বৌকে, ওর সম্পর্কে খারাপ কথা বলে? সেটা কি ঠিক? আমার বন্ধুরাতো ওরও বন্ধু, ওর সম্পর্কে খারাপ কিছু বললে আমার বন্ধুদেরও খারাপ লাগবে, আর ও এসব জানতে পারলে শুধু দুঃখই পাবে। নিজের বউকে জেনে-বুঝে দুঃখ দেওয়াটা কি ঠিক? থুথুটা ওপর দিকে ছেটালে তা তো নিজের গায়ে এসেই পড়ে! গুমরে মরি - নিজেকে নিজেই 'স্তোকবাক্য' শুনাই, হয়ত ঠকাই; যে আর কিছুদিনের মধ্যেই তো সব ঠিকই হয়ে যাবে!

কিন্তু কোন কিছুই ঠিক পথে এগোচ্ছে না। বাড়িতে ওর জন্য স্লিপিং-পিল, অ্যানটাই-ডিপ্রেসেন্ট, 'প্রেসক্রিপশন' আর 'ওভার-দা-কাউন্টার' মেডিকেশন যেন মুড়ি-মুড়কি হয়ে গেছে; আর অ্যালকোহল-তো আছেই, ওর 'বেস্ট-ফ্রেন্ড'! কিন্তু এইসবের কোনটারই কোন সুফল আমি দেখতে পাচ্ছি না, একমাত্র ঐ অ্যালকোহলের কুফলটা ছাড়া; অনেক চেষ্টা করেও ওর চাহিদার সাথে আমি ঠিক এঁটে উঠতে পারছি না। বাড়িতে সিগারেটের ধোঁয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, ভক-ভকান অ্যালকোহলের গন্ধে আমার বমি আসে, আর এইসব প্রত্যক্ষ করে করে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত, বিশেষত মেয়ে তিনটের ওপর এইসবের কু-প্রভাব দেখে; জীবনটাকে দুর্বিষহ লাগে··· একটু হাঁপিয়ে গেছি। একটা সুস্থ-মানুষ যে কি করে এত ওষুধ গপাগপ গিলতে পারে আর তারপরেও অ্যালকোহলের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমি তিন মেয়েকে নিয়ে রাত্তিরে দিব্যি ঘুমাই, দরকার হলে মাঝ রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে কেইটিকে খাওয়াই, ওর ডাইপার বদলাই; কখনো 'টায়ার্ড ফিল' করি না। 'টায়ার্ড ফিল' করি ওর এই অ্যালকোহল আর ওষুধ-গুলোর সাথে লড়তে গিয়ে, শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবে; কিন্তু মাঝে মাঝেই তার প্রভাব শরীরের ওপরেও এসে পড়ে বৈ কি! এই লড়াইটা যে আমি ক্রমশই হেরে যাচ্ছি তা আমি ববুঝতে পারছি, কিন্তু কি যে করণীও সেটা আর বুঝে উঠতে পারছি না। আরও হাজার কয়েক ডলার বেশি রোজগার করতে পারলে হয়ত কিছু সমস্যার সমাধান হয়, এই মনে করেই এই 'কোডাক' কোম্পানিতে দরখাস্ত করেছিলাম। দেখি, এতে যদি আমাদের সম্পর্কের উন্নতিতে কোন সুরাহা হয়! সুবিধা হল এই যে এই চাকরীটা পেলে আমাদের 'মুভ' করতে হবে না, কোডাক ওদের এই 'ওয়েস্ট কোস্টে'র অফিসেরই এক 'জোনাল ম্যানেজার' খুঁজছে – কোয়ালিফায়েড, ইয়াং, এনার্জেটিক, আর উইলিং-টু-ট্রাভেল! এই হাঁপানো শরীরে 'এনার্জি'র আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধু বাকী তিনটের ওপর ভরসা করেই এদিককার জোনাল-অফিসের ইন্টার্ভিউটায় উৎরে গেছি; এবার ডাক পড়েছে ওদের 'হেড অফিসে', ঐ রচেস্টারে।

এই ইন্টার্ভিউয়ের ডাকটা পেয়ে যেন একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছি – একাডেমিয়ার থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে যে মাইনে বেশি! এই কাজটা আমি পেলে লিন্ডাকে আর কাজ করতে হবে না; ও আবার বাড়িতেই থাকতে পারবে, ও আর মদ খাবে না – সেটাই আমার আশা। সেই আশাতে বুক বেঁধেই আজ ওর পেছন পেছন সদর-দরজা পর্যন্ত এসেছিলাম, বিকেলে আমি থাকব না তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, ওকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও একবার আটকাতে চেষ্টা করেছিলাম; অন্তত একটা হাগও যদি আদায় করা যায় – তা আর হল না। গ্যারাজ থেকে ওর গাড়িটা রিভার্সে বার করে ও চলে গেল। গ্যারাজের অটোম্যাটিক দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজে ঘড়-ঘড় করে নিচে নেমে এল আমার চোখের সামনে, গ্যারাজটাকে আবার অন্ধকার করে দিয়ে। ঐ অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকলাম খানিকক্ষন। ঐ ভাবে দাঁড়িয়েই মনে মনে একটা প্ল্যান করে নিলাম যে বাচ্চাদের কি ভাবে রেডি করে, কখন ডে-কেয়ারে নামিয়ে, কখন আমার এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া উচিৎ।

বাচ্চাদের এই ঘুম থেকে তোলার সময়টা আমার কাছে বেশ মজার। অনেক সময়ই ওদের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের পাশে চুপটি করে বসে থাকি আমি, দেখি যে ওরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ওদের মুখের বিভিন্ন পেশী সঞ্চালন করে কত রকম অঙ্গভঙ্গী করে। দেখে কেমন যেন মায়া লাগে, ওদেরকে দেব-তুল্য মনে হয়, সময়টাকে কেমন যেন স্বর্গীয় বলে মনে হয়। এমন সরল, এমন নিষ্পাপ দৃশ্যের দর্শন বোধহয় আর কোথাও সম্ভব নয়। ওরা কখনো হাসে, কখনো বা ডুকরে কেঁদে ওঠে; বোধহয় স্বপ্ন দেখে। কখনো কখনো আমি সেইসব অঙ্গভঙ্গির ছবি তুলি। তারপর ক্যামেরার শাটারের শব্দে ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। পরে ব্রেকফাস্ট-টেবিলে সেইসব ছবি আমি, গ্রেস, আর মায়া একসাথে দেখি, দেখে সবাই একসাথে হাসি; আর কেইটি শুধুই আমাদের মুখ চাওয়া-চায়ি করে, হয়ত ভাবে যে এইসব হচ্ছেটা কি? ওরা জোর করে আবার সেইসব অঙ্গভঙ্গি করার চেষ্টা করে - খুব মজা হয়। গ্রেসকে তুলি তো মায়া আবার শুয়ে পড়ে, আবার মায়াকে তুলি তো গ্রেস আবার শুয়ে পড়ে ওর ছোট্ট

মুখটা ওর ছোট্ট 'লিটল-মার-মেইড ব্ল্যাঙ্কি' দিয়ে ঢেকে দেয়, 'পিক-আ-বু' খেলে; ভাবে যে ওকে বোধহয় আমি আর খুঁজেই পাব না। কেইটির দিকেও নজর রাখতে হয়, না হোলেই তো খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে এক কেলেঙ্কারি হবে! আজ আর সেইসবের সময় হল না। তাড়াতাড়ি তৈরি করে ওদের ডে-কেয়ারে নিয়ে গেলাম।

ডে-কেয়ারের লেডি 'সুসানা ভিডেলা' আগে থেকেই জানত যে আজ আমি নিউ-ইয়র্ক যাব। আমার গাড়িটা ওর 'ড্রাইভওয়ে'তে পার্ক করতেই ও ওর বাড়ির দরজা খুলে এগিয়ে এল, কি যেন একটা বলতে; এমনিতেতো সচরাচর ও ওর সদর-দরজায় দাঁড়িয়েই আমাদের "ওলা" বা "আস্তা মানিয়ানা" বলে! ভাবলাম আজ আমি নিউ-ইয়র্ক চলে যাচ্ছি বলেই হয়ত এই খাতির! বাচ্চাদের ওর কাছে গচ্ছিত করতে করতেই ওকে মনে করিয়ে দিলাম সেই ব্যাপারে, যে কোন এমারজেন্সি হলে ও যেন লিন্ডাকেই ফোন করে, আমি তো থাকব না। ও আমাকে হাত নেড়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইল। ও আর্জেন্টিনার মানুষ। যদিও আমেরিকাতে আছে অনেক দিন, ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করতে পারেনি। এখনও স্প্যানিশ ভাষাতেই কাজ চালায়। স্প্যানিশ ভাষায় আবার আমার জ্ঞান অতি নগণ্য। আমি শুধু বার কয়েক 'নিউ-ইয়র্ক' কথাটাই ওর মুখ থেকে শুনে বুঝতে পারলাম। ঠিকই তো, নিউ-ইয়র্কেই তো যাচ্ছি, এই মনে করে প্রথমে ওকে অবজ্ঞা করে নিজের ড্রাইভার'স সীটের দিকেই এগোচ্ছিলাম, তাড়া আছে না! কিন্তু দেখলাম যে 'সুসানা' আমাকে কিছু একটা বলার জন্য নাছোড়বান্দা। তাই আবার ওর কাছেই ফেরত এলাম, ভাবলাম দেখিই না, কি এমন কথা বলতে চায় ও আমাকে?

সুসানা হয়তো ততক্ষণে বুঝে গেছে যে ওর স্প্যানিশ ভাষা আমি ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছি না। তাই হাত নেড়ে ও আমায় ভেতরে ডাকল, আর তারপর আঙুল দেখিয়ে টিভি দেখার নির্দেশ দিল। স্প্যানিশ ভাষার চ্যানেল হোলেও আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে নিউ-ইয়র্কে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে! সুসানাকে চ্যানেলটা ইংরেজি ভাষায় পাল্টাতে অনুরোধ করলাম। দেখি টুইন-টাওয়ার্সের একটা টাওয়ার জ্বলছে দাউ দাউ করে। সর্বনাশ! লাইভ টেলি-কাস্টে বলছে যে জে.এফ.কে এয়ারপোর্ট থেকে টেক-অফ করা পুর একটা প্লেনই নাকি ঢুকে পড়েছে এই টাওয়ারটার মধ্যে, এটা নাকি কোন 'অ্যাকসিডেন্ট' নয়, এটা একটা জঙ্গি-নাশকতা। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাসই করতে পারলাম না। এমনটা আবার হতে পারে নাকি? খোদ অ্যামেরিকার মাটিতে নাশকতা? আমাদের এই 'স্টেট-অফ-দা-আর্ট' সিকিউরিটিকে ধোঁকা দিয়ে? হতেই পারে না, আমি বিশ্বাস করি না। এই দুনিয়ায় কার ঘাড়ে এমন মাথা থাকতে পারে?

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি আমার ট্যাক্সি এসে হাজির, আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য; ট্যাক্সির বুকিং আগে থেকেই করা ছিল। সুসানার ডে-কেয়ারে টিভি দেখতে গিয়ে আমিই দেরি করে ফেলেছি। গাড়িটা তাড়াতাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে বাড়ির ভেতরে ছুটলাম। ডফেল-ব্যাগটা রেডিই ছিল। জামাকাপড়টা বদলাতে বদলাতে ঘরের টিভিটা চালালাম। আর দ্বিতীয় টাওয়ারটায় প্লেনের ধাক্কা মারাটা দেখলাম - 'লাইভ'। মনে মনে এতক্ষণ একটা প্রশ্ন ছিলই, যে প্রথম টাওয়ারে প্লেন ঢুকে পড়াটা কি সত্যিই কোন জঙ্গি-নাশকতা নাকি তা রিপোর্টারদের শুধুই একটা বাড়াবাড়ি; হতেও তো পারে যে এটা নেহাতই একটা 'অ্যাকসিডেন্ট'! দ্বিতীয় টাওয়ারে প্লেনের ধাক্কা মারাটা দেখার পর মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশই রইল না। টিভিতে আরও কি কি সব বলছে; পেন্টাগনেও নাকি একটা প্লেন আছড়ে পড়েছে! কিন্তু এইসব দেখে আর দেরি করা যাবে না, তাহলে নিজের ফ্লাইটটাই মিস করবো। মাথায় এক রাশ চিন্তা নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পরলাম এয়ারপোর্টে যাবার উদ্দেশ্যে।

এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি আমার ফ্লাইটের ব্যাপারে কোন খবর নেই। বস্তুত কোন ফ্লাইটের ব্যাপারেই কোন খবর নেই। এয়ারলাইনের কাউকে কিছু জিগ্যেস করলে কেউ কিচ্ছু বলছে না। সবাই যেন মুখে কুলুপ এঁটেছে। অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে কানাঘুষো শুনলাম অনেক কিছুই; কেউ বলল যে আজ সকালের সব ফ্লাইট বাতিল, কেউ বলল শুধু দুপুরের গুলো, কেউ বলল সারা দিনের, আবার কেউ বলল সারা সপ্তাহের। এমনটা আবার হয় নাকি? প্রায় হাজার খানেক প্লেন রোজ ওঠা-নামা করে এই এয়ারপোর্টে! তার সবই.....? তা কি করে হতে পারে? কি যে বিশ্বাস করবো, আর কাকেই যে বা বিশ্বাস করবো তার কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। মুশকিল হল এই যে যাদের কথা বিশ্বাস করা যায়, তাদের কেউই কিছু বলছে না। তা হোক, আবার ফেরত গেলাম এয়ারলাইনের কাউন্টারটায়। অ্যাটেনডেন্টসগুলকে বোঝানর চেষ্টা করলাম যে আমার কাছে লুকানর কিছুই নেই; আমি সবই বাড়িতে টিভিতে দেখেই এসেছি, নতুন করে ভয় পাওয়ানোর মত কোন খবরই ওরা আমায় দিতে

পারবে না - তবুও ওদের কারো মুখ থেকেই কিছু বার করতে পারলাম না। ওরা শুধু বলল যে আমার নির্দিষ্ট ফ্লাইটটা নাকি "ডিলেইড বাই আনসারটেইন পিরিয়ড অফ টাইম"। 'আনসারটেইন'? এ আবার কেমন কথা? এত জায়গায় 'ট্রাভেল' করি, কই কোনদিন তো এমনটা শুনিনি! তাও আবার খোদ সান-ফ্রান্সিস্কো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে? ভীষণ বিরক্ত লাগল। খেয়াল করলাম যে এয়ারপোর্টের 'মনিটর'গুলোও সব অকেজো। নাকি ইচ্ছা করেই 'সুইচ-অফ' করে দেওয়া হয়েছে? বাইরের কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। এয়ারপোর্টেরই একটা কাফেতে গেলাম, যদি সেখানকার টিভিগুলো থেকে কিছু জানা যায়। সেখানেও একই অচলাবস্থা। কাফেতে কফি, পেস্ট্রি সবই 'চলছে', শুধু টিভিগুলো ছাড়া। আমার এই এগারো বছরের আমেরিকান জীবনে এমন অচল অবস্থা কোথাও কোনদিন দেখিনি, আমেরিকাতে যে এমনটা হতে পারে সেটাই বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঘড়ি-ধরে, নিয়ম-মাফিক সব কাজ হয় এখানে, এমনটাই তো জানতাম এতদিন!

অগত্যা ভাবলাম যে লিন্ডাকে একটা ফোন করি। ও যদি কিছু বলতে পারে। ফোন ধরে ও বলল যে ও পুরোটাই দেখছে ওর অফিসের টিভিতে, লাইভ; কাজকর্ম সব লাটে! তারপর বলল "ঈস্, টাইমিংটা আর একটু এদিক-ওদিক হলেই তো তুমি নিউ-ইয়র্কে থাকতে, তাই না!" না থাকাতে ও খুশি না অখুশি, বা এটা আদৌ ওর কাছে কোন ব্যাপার কি না; তা বুঝতে পারলাম না। ওর কথা শুনে শুধু মনে হল যে ঐ ধ্বংস হওয়া প্লেন-তিনটের একটায় আমিও থাকতে পারতাম।

এয়ারপোর্টের ভাব-গতিক দেখে বুঝে গেলাম যে আজ আর কোন প্লেন এখান থেকে উড়বে না! তাই একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ির পথে রওনা হলাম। ট্যাক্সির পেছনের সিটটায় বসে টাইটা একটু আলগা করে জামার কলারের বোতামটা খুলে দিলাম, একটু হাঁসফাঁশ-হাঁসফাঁশ লাগছিল, কেমন যেন ফাঁসীর দড়ির মত চেপে ধরেছিল এই টাইটা! শুধুই কি টাই, নাকি জীবনটাই? ড্রাইভারকে শুধু বলে দিলাম যে কোথায় যেতে হবে। গা-টা এলিয়ে দিয়ে শুধু এটাই ভাবছিলাম যে ঐ অভিশপ্ত প্লেন তিনটের একাটায় আমি থাকলে সেটা কি আমার জন্যও অভিশাপ হতো, নাকি আশীর্বাদ? একবার মনে হল যে থাকলে ভালোই হত, ল্যাঠা চুকে যেত। লাইফ-ইনস্যুরেন্স তো করাই আছে, ঘটনাচক্রে সেই ইনস্যুরেন্স কোম্পানির নামও আবার 'নিউ-ইয়র্ক লাইফ'! তার থেকে ও মিলিওন-ডলার পেয়ে যেত। সেটাই তো চায় ও আমার কাছ থেকে, ডলার - আরও ডলার। ঠিক সেটাই হত, আর আমাকে নিত্য ডলার-মেশিনের মত 'ইউজ' করাটা ওর জন্মের মত ঘুচে যেত। একটা মিলিওন ডলারের 'পে-চেকে'ই সেটা চিরতরে থেমে যেত। আর আমার কোন পরিচয় আছে এখন? আমি মানুষটা খারাপ না ভালো, আমার কি ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাতে কি আর ওর যায়-আসে কিছু? আমার দামতো শুধুই আমার ঐ 'বাই-উইক্লি' পে-চেকটার ওপর যে 'অ্যামাউন্ট'টা লেখা থাকে, ঠিক তার সমান। প্রকারান্তরে ঠিক সেটাই হত - আমি হয়ে যেতাম 'মিলিওন-ডলার-ম্যান'! নিউ-ইয়র্ক সিটির ঐ যে জায়গাটাকে এখন বলা হচ্ছে 'গ্রাউন্ড-জিরো', সেখানেই শুয়ে আমি হয়ে যেতাম 'হিরো'! নিউ-ইয়র্ক সিটির 'গ্রাউন্ড-জিরো'য়, 'নিউ-ইয়র্ক লাইফে'র ইনস্যুরেন্স-চেকটার সৌজন্যে মিলিওন-ডলার-'হিরো' হয়ে শুয়ে, এই বত্রিশেই মোক্ষ লাভ করেছি আমি, কোনরকম সাধনা বা সন্ন্যাস ছাড়াই, সব অশান্তির শেষে চির-শান্তিতে ঘুমিয়ে আছি আমি; ভেবে বেশ ভালোই লাগল। পরক্ষনেই সামলে নিলাম নিজেকে, এইসব কি ভাবছি আমি? গ্রেস, মায়া আর কেইটি তো আমাকে ছাড়া শুতেই যেতে পারে না! সকালেই বা ওদের ঘুম থেকে তুলবে কে? আর তুললেও, তারা কি আর ওদের ঘুমন্ত-মুখের অঙ্গভঙ্গির ছবি তুলে রাখবে? সেসব ছবি তুলে না রাখলে চলবে কি করে? হেল্প না করলে মায়াটা তো টুথ-ব্রাশটাই ঠিকঠাক ধরতে শিখল না এখনও, তা 'সেই হেল্প'-টা করবে কে? গ্রেসও তো জুতোর ফিতেটাই বাঁধতে শিখল না আজ পর্যন্ত; জুতোটা কোনরকমে পায়ে গলিয়ে দিয়েই পা-টা বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে, ফিতে বেঁধে দেবার জন্য - তা 'সেই ফিতে'টা বাঁধবে কে? কোথাও যাবার জো আছে আমার? মোক্ষ আর শান্তি কি অতই সস্তা? সুসানার কাছে আজ সকালে বাচ্চাদের পাচার করার সময় দেখে এসেছিলাম যে কেইটি মহা আনন্দে ওর ডান হাতের বুড় আঙুলটা চিবচ্ছিল, পারে তো ওর পুর মুষ্টিটাকেই মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় আর কি! ওর বোধহয় মাড়ি শুলায় আজকাল, খুব শিগগিরিই হয়ত ওর দাঁত ওঠা দেখতে পাব!

মাঝ দুপুরেই বাড়ি ফেরত এলাম। 'উইকডে'র ভরদুপুরে বাড়ির পরিবেশটা কেমন যেন অচেনা লাগল, কেমন যেন একটু থমথমে। লিন্ডা নেই, বাচ্চারা নেই; ফিস-ট্যাঙ্কের মাছ-গুলর ক্লান্তিহীন সাঁতার ছাড়া শুনশান বাড়ির চেহারাটা কেমন যেন প্রাণহীন, শুধু বড় আর ছোট লিভিং-রুমের দেওয়াল-ঘড়ি দুটো অবিরাম কথা বলে চলেছে নিজেদের মধ্যে – টিক-টক, টিক-টক। আওয়াজটা যে এত জোরে শোনা যায় সেটা আগে কখনো খেয়াল করিনিতো! কিছু ফোন-কল করার ছিল, সেগুলি সেরে নিলাম। প্রথমে রচেস্টারে 'কোডাকে', তারপর আমার কাজে

ইউনিভার্সিটিতে। কোডাকের ইন্টার্ভিউটা দু-সপ্তাহ বাদে রি-স্কেজুল করা হোল। প্লেনের টিকিট ওরাই কেটেছিল, ওরাই সেটা রি-বুক করে আমাকে তার ই-মেইল কনফার্মেশন পাঠিয়ে দেবে তা জানিয়ে দিল। এদিকে আমার কাজ থেকে মঙ্গল-বুধ ছুটি নিয়েছিলাম; মঙ্গলে-তো আর কিছুই হল না, মাঝখান থেকে ছুটিটাই শুধুশুধু জলাঞ্জলি গেল। সেক্রেটারি 'মারিয়া'কে বলে দিলাম আমার বুধবারের 'ছুটি' 'ক্যান্সেল' করে দিতে, আর 'ডক্টর স্টিফেন্স'কে জানিয়ে দিতে যে আগামীকাল ওনাকে আর আমার হয়ে 'সাব' করতে হবে না। মারিয়া শুনে খুব খুশি হল যে আমি এখনও এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই - 'সেফ'। পরে দু-একজন 'কলিগ' আর স্টুডেন্টসদেরও ফোন-কল পেলাম, তারাও সবাই জানাল যে আমি 'সেফ' জেনে তারা আশ্বস্ত।

বাচ্চাদের কিচিরমিচির ছাড়া এই শুনশান বাড়িটাকে কেমন যেন শ্মশানপুরীর মত লাগছিল। তাই তড়িঘড়ি ডে-কেয়ারে গেলাম ওদের তুলতে – ওদের সাথে আজ বেশ খেলা করা যাবে এখন! 'সুসানা'ও আমাকে দেখে খুব খুশি হল, ওর ভাঙা-ইংরেজি, আর স্প্যানিশ মিশিয়ে আমাকে বোঝাল যে কি আশ্চর্য - ও তো আজ সকালে এত করে আমাকে এটাই বলতে চেয়েছিল যে আজ আর আমার নিউ-ইয়র্ক গিয়ে কাজ নেই! গ্রেস আর মায়া আমাকে দেখে আনন্দে হাত তালি দিয়ে আর ওদের চুলের ঝুঁটি দুলিয়ে বারকয়েক লাফাল, আর সুইঙে দোল খাওয়া কেইটি ওর প্রায় 'ন্যাড়া-মুণ্ডি' মাথাটা একদিকে হেলিয়ে, মুখ থেকে দুধ উগলে, জিভ বার করে ফোকলা মুখে এমন ফিক করে হাসল যে ও যেন আগে থেকেই জানত যে আজ ওকে আমিই বাড়ি নিয়ে যেতে আসব! যা ভেবেছিল ঠিক তাই হওয়াতেই এই নির্মল হাসি-উপহার! এমনিতেতো ওদের মা-ই আসে ওদেরকে বাড়ি নিয়ে যেতে।

বাড়ি ফিরে লিন্ডাকেও ফোন করে কথাটা জানিয়ে দিলাম, যে মেয়েদের ডে-কেয়ার থেকে তুলে নিয়েছি। ও বলল যে ও-ও আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে, ওর অফিস আজ একটু আগে-আগেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, জঙ্গি-নাশকতার ভয়ে। এদিকে নাকি আমাদের এই এত সাধের 'গোল্ডেন-গেট' ব্রিজটাকেও জঙ্গি-নাশকরা 'টার্গেট' করে থাকতে পারে। তাই রাস্তা-ঘাট সব বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ও বাড়ি ফিরে এল। আমরা সবাই মিলে দিনের বাকী সময়টা আমাদের বড় লিভিং-রুমের বড় টিভিটার স্ক্রিনে চোখ সেঁটে বসে থাকলাম।

টিভিতে আজ শুধুই জঙ্গিদের নাশকতার খবর। কান্নাকাটির খবর। বেশীরভাগ 'ভিকটিম'কেই এখন 'নিখোঁজ' বলে চালানো হচ্ছে, অথচ তাঁরা যে মৃত সেটা অবশ্যম্ভাবী। যেন 'অনেক কিছু আশা' করার পরেও আবার 'আরও বেশি কিছু আশা' করা! 'এই' আশা করাটার যেন আর কোন শেষ নেই! এই 'নিখোঁজ'-'মৃত'দের পরিবারের লোকজন আকুলি-বিকুলি করে কেঁদে-কেটে টিভিতে এমন করে সব ইন্টারভিউ দিচ্ছে যে দেখে কেমন যেন মনে হল। আচ্ছা, এখানে যা দেখাচ্ছে - এইসব কান্নাকাটির পুরোটাই কি সত্যি, সৎ? এই কান্নাকাটির পুরোটাই কি মানুষ-গুলোর জন্য, নাকি 'ডলার-মেশিন'? এই মৃতদের মধ্যে এমন কেউই কি নেই, যাঁদের নিজেদেরই 'সেই আশা'টার হয়ত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, যাঁদের জীবনগুলি হয়ত হয়ে উঠেছিল প্রহসন আর ফাঁকি; যারা প্লেন তিনটেতে ওঠার আগেই জীবনের চাহিদা মেটাতে মেটাতে ফুরিয়ে গিয়ে হয়ে গিয়েছিল জীবন্মৃত? যারা হয়ত মরেই বেঁচে গেল?

সন্ধেবেলা কোলকাতা থেকে দাদার ফোন এল। ও বলল "কিরে 'মানু', তোদের ওখানে নাকি কাল কি সব হয়েছে? তোরা সবাই ঠিক আছিস তো?" ওকে বোঝালাম যে আমার এখানে 'কাল' নয়, 'আজ', আজকেই সাত-সকালে; নিউইয়র্কে সকাল নটা নাগাদ, আর আমার এখানে ক্যালিফোর্নিয়ায় ভোরে। 'এখানে' ক্যালিফোর্নিয়াতে কিছুই হয়নি, যা হয়েছে তা নিউ-ইয়র্কে। আমাদের মাঝে দূরত্ব হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের তিন গুন, চার-চারটে 'টাইম-জোন' পেরিয়ে! ভাবলাম একবার বলি যে আমার এখানে যা ঘটেছে বা ঘটছে তা 'আজ'কের নয়, তা অনেকদিনের; তা কন স্কাই-স্ক্র্যাপারে বা টাওয়ারে নয়, তা আমাদের এই একতলা বাড়িটার ভেতরেই! তা আমাদের বেড-রুমে, তা আমাদের লিভিং-রুমে, তা

আমাদের ‘ফ্রন্ট-ইয়ার্ডে’, তা আমাদের ‘ব্যাক-ইয়ার্ডে’; তা আমাদের মনে। আমাদের এই বাড়িটায় কোন প্লেন আছড়ে পড়েনি, আছড়ে পড়েছে আমাদের জীবন। তারপর ভাবলাম যে না থাক, কি হবে বলে? ও কি আর বুঝবে? আমি নিজেই কি ছাই ঠিকঠাক বুঝি, যে ওকে বোঝাব? এইসব কি আর বলে বোঝানো যায়? শুধু জানালাম যে অনেক রাত হল; মেয়ে-তিনটের চোখগুলো ঘুমে ঢুলু ঢুলু, আমি সাথে না শুলে ওরা শুতে চায় না, তাই এবার শুতে যাই। ফোনটা হ্যাং-আপ করে ভাবলাম ঠিকই তো, সময়মত শুতে না গেলে চলবে কি করে? কাল ভোরেইতো আবার সেই কয়েকটা গুঁতো খেয়ে উঠতে হবে, দরজায় খিল দিতে হবে না?

পুনশ্চ: এরপর আর বছর-খানেকের মধ্যেই গৌতম-লিন্ডার আলাদা জীবন শুরু হয়, তিন মেয়েকে প্রতি এক সপ্তাহ অন্তর ভাগাভাগি করে।

September, 2014 মিনেসোটা, ইউ.এস.এ

সাগর সঙ্গমে

মায়া ব্রহ্ম

‘গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবেন সাগর সঙ্গমে।’

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এক হৃদয় বিদারক বিখ্যাত কবিতাটি সৃষ্ট হয়েছে ‘দেবতার গ্রাসে’। কেমন সেই তীর্থস্থান? অবশ্য জানা আছে কপিল মুনির মন্দির স্থাপিত আছে। আর স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। পৌষ সংক্রান্তির দিনটিতে। কথায় বলে ‘সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার’। কিসের টানে যুগ যুগান্ত কাল থেকে সারা ভারতের মানুষ আবালবৃদ্ধবনিতা, সাধু-সন্ত, পর্যটক প্রমুখেরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নীচে বা অস্থায়ী ছাউনির তলায় মাসাধিকালের জন্যে বাক্স বিছানা পোটলা পুঁটলি নিয়ে শুয়ে বসে থাকেন ? পৌষ সংক্রান্তির দিনটিতে সাগর সঙ্গমে পুণ্য স্নান করে অক্ষয় পুণ্য লাভ করবেন। গঙ্গার পাড়ে রাঁধেন, বাড়েন, খান। তবে সুযোগ একবার এসে গেল। তখন আমার বড় নাতি, নাতনী বেশ ছোট। বেয়াই মশাই এসে বললেন, “বেয়ান, যাইবেন নাকি গঙ্গাসাগরে”? ওঁর বড় ছেলে শেখর রায় সে সময় ওখানে ব্লক অফিসার। ওর গাড়ীতেই আমরা রওনা হলাম। বেয়াই মশাই, বেয়ান দোলন-দি। বিকেল, বিকেল পৌঁছে গেলাম কাকদ্বীপে। এখানে সরকারি অফিসার যারা সাগর দ্বীপে যাবেন, তাঁদের জন্যে বসার ব্যবস্থা করা আছে। আমরা একটু ঘুরে ফিরে দেখলাম। মানুষ আর মানুষ, লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে দুটো। পোটলা পুঁটলি, বাক্স বিছানা নিয়ে সব তীর্থ যাত্রীরা একে একে উঠে যাচ্ছেন। অবশ্যই এই যাত্রা শুরু হয়ে গেছে মাসাধিকাল আগে থেকেই। হারউড পয়েন্টে লঞ্চগুলি এসে দাঁড়ায়।

আকাশের লালিমা মিশে যায়, গঙ্গার ওপারে নিরুত্তাপ সূর্য তখন অস্তমিত। সূর্যাস্তের এমন অপরূপ শোভা, আর একটি ছবি যোগ হল স্মৃতির মণিকোঠায়। লঞ্চ এসে গেছে সরকারি অফিসারদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। শেখরের সঙ্গে ওপরে উঠে গেলাম। বেয়াই মশাই, দোলন-দি, আরও অনেকে কেবিনে বসেছেন। দোলন-দি আমাকে ডাকেন, ভেতরে এসে বসুন। শেখরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি রেলিং ধরে। সে যে কি হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া। গঙ্গার ও পারে সবুজ, হলুদের আলোর মালা জ্বলছে, নিবছে। দেখতে দেখতে গঙ্গার এপারে কুচবেড়িয়ায় এসে গেলাম, পাড়ে দাঁড়ানো লাইন করে কটি মিনিবাস। আমরা নির্দিষ্ট, বাসে করে তিরিশ মাইল পেরিয়ে এলাম সাগর-দ্বীপে। সরকারের অফিস বাড়িতে কিছুক্ষণ বসে, এলাম মেলায়। বালিতে পা ডুবিয়ে হাঁটি চারপাশে দেখতে দেখতে। অগুনতি মানুষের চলাফেরা, খোলা আকাশের নিচে কাঁথা কম্বল মুড়ে শুয়ে বসে থাকা রান্না খাওয়া। অস্থায়ী দরমার ঘর। দোকান আর দোকান। বড় বড় স্তম্ভে জোরালো আলো দিনের আলোকে হার মানায়। শেখরের জন্যে রাখা নির্দিষ্ট ঘরে আমাদের জিনিসপত্র রেখে গুছিয়ে বসি। চৌকিতে আমি, দোলন-দি। মেঝেতে পুরু খড় বিছানো, মোটা শতরঞ্জি পাতা। বেয়াই মশাই, শেখর, গাড়ির ড্রাইভার, যে যার বিছানা পেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। শেখর দোকান থেকে রাতের খাবার নিয়ে এলো পুরি তরকারি। সঙ্গে ছিল নলেন গুড়ের সন্দেশ। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে, শোবার ব্যবস্থা করা গেল, এনেছিলাম হাওয়া বালিশ, কালিম্পঙের কম্বল, বাবা এটি আমাকে দিয়েছিলেন। এতদিনে কাজে লাগল৷ ক- হাত দূরে দূরে মাইকে গান, আর অ্যানাউন্স হচ্ছে, পুণ্যস্নানের সময়। কি ভীষণ চিৎকার হৈ চৈ গণ্ডগোল, লক্ষ লক্ষ মানুষের কথাবার্তা। দোকানে দোকানে উনুনের ধোঁয়ায়, আকাশে ধোঁয়াশা। দুকানে হাত চাপা দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছি।

সময় মত উঠে তৈরি হয়ে এসে দাঁড়ালাম সাগর তীরে৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ সাগরে পুণ্যস্নানে নেমেছেন। স্ত্রী, পুরুষ, সাধু, সন্ন্যাসী স্নান করছেন পর পর ডুব দিয়ে ভক্তি ভরে। পূবমুখি হয়ে জোড়হস্তে প্রণাম জানাচ্ছেন দেবতাকে। সাগর-তীর্থে আমি স্নান করতে পারিনি ঠিকই তবে শেখরের আনা বোতলের জল মাথায় দিয়ে বিশেষ অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে প্রণাম জানিয়েছি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের প্রতি। পূজার উপকরণ হাতে লক্ষাধিক মানুষের চাপে এগিয়ে চলেছি কপিল মুনির মন্দিরের দিকে। দূর থেকে দেবতার উদ্দেশে পূজোর ফুল ফল ছুঁড়ে দেওয়া হল। পূজারী ওপরে বসে, প্রসাদী ফুল, ফল, পুণ্যার্থীর ভিড়ের দিকে ছুঁড়ে দেন, লেগে যায় হুড়োহুড়ি, নানা ভাষাভাষীর চিৎকার, চেঁচামেচি। স্বেচ্ছাসেবকরা ভিড় সামলাচ্ছেন। মন্দিরের যাবার পথে দু’ ধারে চোখে পড়ে এক অমানবিক দৃশ্য। ছেঁড়া ন্যাকড়া গায়ে জড়ানো, হাতে পায়ে পটি বাঁধা অসহায় মানুষের দল। শুয়ে বসে শারীরিক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কত ভিখিরির ছোট ছোট শিশুগুলি বুকের ওপরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় খোলা

আকাশের নীচে শুয়ে হাত, পা ছুঁড়ে কেঁদে চলেছে। কি নিদারুণ করুণ অবস্থা ভাবা যায় ? হাতে ঝোলানো বটুয়া থেকে টাকা, আধুলি, সিকি দিতে দিতে এগিয়েছি। এতে আর কতটুকু হয়? সিন্ধুতে বিন্দু। এলাম সাগরের তীরে, এখনও চলেছে পুণ্যস্নান। আকাশের নীলিমায় সাগরের লালিমায়, দিনের দিনমণি উদয় হচ্ছেন। সহস্রাধিক বা আরও বেশি মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে,

ওঁ জবা-কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং

ধ্বন্তরিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।।

এবার মেলা ঘুরে ঘুরে দেখা ও নাতি, নাতনীদের জন্যে কিছু কেনাও হল। আরেক বার এসে দাঁড়িয়েছি সাগর তীরে। বেলা দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল রশ্মিতে সাগরের সমগ্র জলরাশির উচ্ছল ভাঙা ঢেউ গুলি সোনারূপোয় জড়ানো। চোখ যায় ঝলসে। মনে আনন্দের শিহরণ আজ আমি গঙ্গাসাগরে এসেছি। সূর্যের স্বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে সাগরের ঢেউ এ ঢেউ এ। সৃষ্টি বৈচিত্র্যর কি অপরূপ মহিমা। দিক চক্রবালের শেষ সীমায় আকাশ মিশে গেছে। মনে পড়ে যায় --- (ভারত তীর্থ) গানটির কথা।

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাঁড়ায়ে নমি নরদেবতারে

উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে।।

ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর।

হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা

দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।।

এবার ফেরা মিনিবাসে। এলাম কচুবেরিয়া। ফেরি লঞ্চে পারাপার। কাকদ্বীপে শেখরের ঘরে জিনিষ রেখে দুপুরের খাওয়া সারা হল। গঙ্গার পাড়ে টিন দরমার লম্বাটে ঘরে চার উনুনে রান্না হচ্ছে। শেখরের ঘরে খাট বিছানা সবই আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামও নেওয়া হল। মা গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে গাড়িতে জয়নগরে এলাম। জয়নগরে এসেছি আর জয়নগরের মোয়া, খেজুর গুড়ের পাটালী কিনবো না? তা কখনও হয়? বাড়ী ফিরতে কিছুটা দেরী হল। নাতি, নাতনী দুজনে এসে জড়িয়ে ধরেছে। দিদি কি এনেছ? খেলনা পেয়ে খুব খুশি। নাতি অভিষেকের জন্যে কিনেছিলাম একটা ক্যামেরা। সব রেখে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে বসে পড়েছে। রূপসা ব্যস্ত রান্নাবাটি, পুতুল নিয়ে। নাতি নাতনীর অনাবিল আনন্দে মন আমার পরিপূর্ণ।

(সৌজন্যে: রুবি বিশ্বাস)

পুরুষাসুরেরা নারীর বধ্য

অজয় চক্রবর্তী

ভোলানাথের অনুমতি নিয়ে দেবী দুর্গা প্রতি বছর সপরিবারে তার বাপের বাড়ি আসেন। বাপের বাড়ি বলতে এই ধরাধাম। দেবী দুর্গা সমস্ত ধরাধামকেই তাঁর বাপের বাড়ি মনে করেন সত্য তবে আমাদের এই বঙ্গভূমিই দেবীর 'ডি ফ্যাক্টো বাপের বাড়ি'। কেননা, বাঙালী মাতৃভক্তের জাত। ভক্তিরসে বাঙালী পান্তুয়ার মতো ডুবে আছে। গৌরবর্ণ ভক্তদের ক্ষেত্রে 'পান্তুয়া' শব্দটির বিকল্পে 'রসগোল্লা' শব্দটি বোধকরি অধিকতর উপযুক্ত। বাঙালীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, মায়েরাই সমস্ত শক্তির, সমস্ত সম্পদের উৎস-স্বরূপা। সম্পদ চাও তো দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা কর; জ্ঞান বুদ্ধি চাও তো দেবী সরস্বতীর আরাধনা কর, আর যদি শক্তি চাও তো মহিষাষুরমর্দিনী দেবী দুর্গার উপাসনা কর, করালিনী কালী বা চণ্ডীর বন্দনা কর। বাঙালী যতটা মাতৃভক্ত ততটা পিতৃভক্ত নয়। একথা বোধকরি মিথ্যা নয় যে মায়ের শক্তির কাছে বাপের শক্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাই বাবা ভোলানাথ রণরঙ্গিণী বা কালীর পায়ের তলায় গড়াগড়ি খান।

নিন্দুকেরা বলেন, বাঙালীরা স্ত্রৈণ, তাই দেবীরাই তাদের উপাস্য। আমি অবশ্য তাদের সঙ্গে একমত নই। আমি বলি স্ত্রৈণতা কেবল বাঙালীর স্বভাব নয়। দেবাদিদেব মহাদেব বাঙালী ছিলেন এমন কথা শুনি নি, কিন্তু তিনি যে ঘোর স্ত্রৈণ এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। দেবী কালীর পদতলে শায়িত শিবকে দেখে বোধকরি কেউ একথা অস্বীকার করবে না।

স্ত্রৈণতাকে আমি দোষ বা অবগুণ বলি না। আমরা যারা গৃহপালিত তারা জানি যে, গৃহের ত্রিসীমানায় কাকচিলের উপদ্রব অপনয়নে যাদের বাক্-যন্ত্রের সক্রিয়তা অপরিহার্য, যারা পালিত স্বামীদের জন্য অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করেন, তাদের বংশের বাতির জোগান দেয় তাদের বশে না থাকলে রসেবশে জীবননির্বাহ হয় না। এই বশ্যতাকে যদি স্ত্রৈণতা বল তো বল, কিন্তু এই স্ত্রৈণতা কদাপি নিন্দনীয় নয়।

একথা বলেছি যে, দেবী দুর্গা মহেশ্বরের অনুমতি নিয়েই প্রতিবছর বাপের বাড়ি আসেন। এই অনুমতি অবশ্য সহজে মেলে না, কেননা মহেশ্বর একথা আজও ভুলতে পারেননি যে ,তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সতী তাঁর পিতা দক্ষের বাড়ি গিয়েই দেহত্যাগ করেছিলেন। দক্ষকন্যা সতীও শিবের অনুমতি ছাড়া কিছু করতেন না। তাই তিনি ভোলানাথের কাছে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁর পিতার আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অভিলাষে। বলা বাহুল্য, মহেশ্বর সতীকে বিনা নিমন্ত্রণে তাঁর পিত্রালয়ে যেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু সতী তাঁর সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না। নানান যুক্তিতর্ক দিয়ে, চোখের জল নাকের জল বর্ষণ করে শেষ পর্যন্ত সতী তাঁর স্বামীর সম্মতি আদায় করে নিয়েছিলেন। স্বামীর অনুমতি নিয়েই সতী বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। এই হঠকারিতার জন্যই এক সতী খন্ড খন্ড হয়ে একান্ন পীঠস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দুর্গা যখনই বাপের বাড়ি যাবার কথা বলেন তখনই শিবের মনে পড়ে যায় সতীর কথা, দক্ষযজ্ঞের কথা, শ্বশুর দক্ষের কথা। তাই তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ভার্যাকে বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি দিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু ভার্যারা জানেন, অনুমতি কেউ কাউকে দেয় না, অনুমতি আদায় করে নিতে হয়। বলা বাহুল্য; পার্বতীও শেষ পর্যন্ত শিবের অনুমতি নিয়েই ছাড়েন। অনুমতি আদায় করে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরী, কেননা স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বাধধী স্ত্রীরা কিছুই করেন না। দেবী দুর্গা শিবের অনুমতি নিয়েই পুত্রকন্যাসহ বাপের বাড়ি যান।

আমার সংসারের ব্যাপারটা আলাদা। আমার স্ত্রী ভাবেন, তিনি যা করেন তাতেই আমার সম্মতি আছে, সায় আছে। তাই আমার অনুমতি নেবার প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর। তাই হালে আমি এমন ব্যবস্থা করেছি যে, এখন আমার স্ত্রী আমার অনুমতি ছাড়া কুটোটিও নাড়তে পারেন না। কেননা আমি তাকে আগাম অনুমতি দিয়েই রেখেছি ইচ্ছে মত চলার। মনে মনে বলি, 'কেমন জব্দ? এবার কর তো দেখি আমার অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ!' কিন্তু, আমার সংসারের কথা এখন থাক। বলছিলাম হরগৌরীর কথা – তাদের প্রসঙ্গেই ফিরে যাই।

শিব যখন দেখলেন অনুমতি না নিয়ে গৌরী তাকে কিছুতেই ছাড়বেন না তখন তিনি বললেন, 'বেশ, তবে যাও।'

মা দুর্গা বললেন, 'এটা কী বললে তুমি? জান না, 'যাও' বলতে নেই? 'এসো' বলতে পারলে না? তুমি কি চাও না আমি ফিরে আসি?'

গৌরীর ভৎর্সনার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে ভোলানাথ বললেন, 'বেশ, ঘুরে এসো'। মা দুর্গা শিবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, সতীদি যখন বাপের বাড়ি যাবার জন্য তোমার অনুমতি চেয়েছিল তখন তুমি তাকে কী বলে অনুমতি দিয়েছিলে ? তুমি কি তাকে বলেছিলে , 'বেশ, তবে যাও।' ?

অতিবৃদ্ধ শিবের কি আর এতকাল আগের কথা মনে আছে ! তিনি ভাবতে লাগলেন, কী বলেছিলেন তিনি সতীকে ?

দুর্গা ততক্ষণে নিশ্চিত, শিব অবশ্যই 'বেশ, তবে যাও' বলে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তিনি চলে গেছেন আর ফিরে আসেন নি।

দুর্গা বললেন, ' তুমি কি একথা জান না যে, তুমি মহেশ্বর ? তুমি জান না যে, তুমি বাকসিদ্ধ ? তুমি যা বল তার অন্যথা হয় না। তা সত্ত্বেও আমাকে তুমি 'বেশ, তবে যাও' বললে ? কেন ? আবার ছাদনাতলায় যেতে চাও নাকি ?

গৌরীর শেষ প্রশ্নের উত্তরে শিব সহাস্যে বললেন, ' সে আশঙ্কা করো না। তুমি ছাড়া এই অতিবড় বৃদ্ধকে কেউ বরমাল্য পরাবে না।'

শিবের কথা পৃষ্ঠে গৌরী অসতর্কভাবে কথাটা বলেই ফেললেন যে কথাটা এতকাল শিবকে জানতে দেননি।

গৌরী বললেন, 'আমি তো তাই ভাবতাম। কিন্তু তুমি জান না, আমার বাপের দেশ ধরাধামে সমস্ত অনূঢ়া মেয়েরাই তোমার মতো বর চায়। তোমার মতো বর তো আর গণ্ডায় গণ্ডায় নেই তাই মেয়েগুলি আসলে তোমাকেই চায়। অবিবাহিত মেয়েরা 'বর-বর' করতেই পারে, কিন্তু অন্যের বরকে মনে মনে কামনা করাটা কেবল 'বর-বরতা' নয়, রীতিমতো বর্বরতা।'

শিব একথা শুনে সহাস্যে বললেন, 'কই, ধরাধামের অবিবাহিত শালীরা যে আমাকে বিয়ে করতে চায় তা তো বলো নি কোনোদিন।'

গৌরী বুঝলেন, কথাটা শিবের কানে তোলাটা ঠিক হয়নি। অনূঢ়া মেয়েদের শিব 'শালী' বলায় গৌরী ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন, 'শালী ? কাদের তুমি শালী বলছো ? ওরা সকলে আমাকে মা বলে। তুমি তো তাদের বাপ গো।'

শিব রসিকতা করে বললেন, 'ওরা তোমাকে মুখে মা বললেও মনে মনে ঠাকুরমা কিংবা দিদিমা ভাবে। ভেবে দেখো, ওদের মা-বাবারাও তো তোমাকে মা বলে ! ধরাধামে তুমি যেমন মা তোমার কন্যা লক্ষ্মী এবং সরস্বতী – ওরাও তেমনি মা। চন্দ্রদেবের মুখে শুনেছি ধরাধামে সকলের কাছে সে 'চাঁদমামা'- ছেলেরও মামা, বাপেরও মামা। কাজেই, তোমার প্রতি তাদের মাতৃ সম্বোধনের দোহাই দিয়ে তুমি আমাকে আমার ন্যায্য শালীদের বাপ বানাতে পার না ।'

গৌরী আর কথা না বাড়িয়ে পুত্রকন্যাদের তৈরি করতে চলে গেলেন। ওরাও প্রতি বছর মায়ের সঙ্গে তাদের মামা বাড়ি যান। ওরা তৈরি হয়েও ছিল । গৌরী বললেন, 'তাহলে এবার রওনা হওয়া যাক। '

-গণেশ বললেন, 'যাবার আগে বাবার অনুমতি নিয়ে আসি। '

-অনুমতি তো আমি নিয়েই রেখেছি।

-তাহলেও বাবাকে একবার বলে যাই। তাছাড়া তুমি তো জানো, আমি সিদ্ধিদাতা। আমরা তো বেশ কিছুদিন কৈলাসে থাকবো না। তাই যাবার আগে বাবাকে বেশ খানিকটা সিদ্ধি দিয়ে যেতে হবে।

গণেশ চলে যেতেই রূপবতী লক্ষ্মী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিলেন। তারপর মা গৌরী কে বললেন, ' মা, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?'

মা দুর্গা তাঁর কন্যার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'যতক্ষণ তোর পাশে তোর বাহন পেঁচা আছে ততক্ষণ কে তোকে অসুন্দর বলবে ?'

* * * *

মা দুর্গা সপরিবারে বেড়িয়ে পড়েছেন। কৈলাসে এখন মহেশ্বরের সঙ্গে নন্দী আর ভৃঙ্গী। পূজোর কটা দিন নন্দী-ভৃঙ্গী ভোলানাথের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পান। এই সময় তারা মহেশ্বরের কাছ থেকে নানান কথা জানতে পারেন।

গৌরী চলে যেতেই নন্দী-ভৃঙ্গী এসে বসলো শিবের কাছে। নন্দী বললো,'বাবা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?'

-কী কথা? বল শুনি।

-আপনি তো পরমেশ্বর। অসীম শক্তিমান। আপনার অসাধ্য কিছু নেই। তাহলে মহিষাসুরকে বধ করার জন্য মা গৌরীকে কেন পাঠিয়েছিলেন?

-সে অনেক কথা। দেবতারা তো আমার কাছেই এসেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র আমায় বলেছিল, 'দেবাদিদেব, আপনি আপনার মহি-শ্বশুরকে বধ করেছিলেন। কাজেই, মহিষাসুরকে বধ করার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।'

ভৃঙ্গী বললো, বাবা, মহি-শ্বশুর কে ছিলেন ? তাকে আপনি কবে বধ করেছিলেন ? শিব হেসে বললেন, আমার মহি-শ্বশুরকে চিনতে পারলি না ? 'মহি' কথাটার অর্থ হল 'পৃথিবী'। মহি-শ্বশুর বলতে দেবরাজ আমার পৃথ্বীবাসী শ্বশুর দক্ষের কথা বলতে চেয়েছেন।

-তা, দেবরাজের অনুরোধ আপনি রাখলেন না কেন? আপনি না গিয়ে মহিষাসুর বধের জন্য মাকে কেন পাঠিয়েছিলেন ?

-সে আরেক গল্প। ব্রহ্মা মহিষাসুরকে এই বর দিয়েছিলেন যে, কোনো পুরুষ দেবতা,দানব,মানুষ কিংবা গন্ধর্ব তাকে বধ করতে পারবে না। সে কেবল নারীরই বধ্য হবে। ব্রহ্মার মুখের কথা যাতে মিথ্যা না হয় সে কারণেই আমরা গৌরীকে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলাম। আসলে দুর্গা-মহিষাসুর যুদ্ধে আমরা পুরুষ-দেবতারাই ছিলাম গৌরীর নেপথ্য শক্তি । আমরা আমাদের নানান অমোঘ আয়ুধ দিয়ে সুসজ্জিতা করে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম।

নন্দী বললো, 'বাবা, ব্রহ্মা মহিষাসুরকে এমন বর কেন দিয়েছিলেন?'

মহেশ্বর বললেন, 'ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি ব্রহ্মাকে করেছিলাম।'

-উত্তরে ব্রহ্মা কী বলেছিলেন,বাবা ?

- ব্রহ্মা সহাস্যে বলেছিলেন, পুরুষাসুরেরা তো চিরকাল নারীদের হাতেই মরে।'

ছেলেবেলার স্মৃতি-চারণ

সুশোভিতা মুখার্জি

উফ, কি গরম পড়েছে। আজ বৃষ্টি হবেই হবে। জুলাই এর শেষ, তাপমাত্রা ৯০ পেরিয়েছে বেশ কিছুদিন। মিড-ওয়েস্ট এর আবহাওয়া প্রায়ই এরকম অতিমাত্রা হয়…. যেমন শীত তেমন গরম। দূরের ঘাস গুলো সব বর্ণহীন। আজ কোন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। এতক্ষণে প্রচণ্ড বৃষ্টিও নেমেছে। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে শৈশবের স্মৃতিতে ডুব দিলাম। এইরকম বৃষ্টি হত বোকারোতে। বিহার রাজ্যের (অধুনা ছত্তিসগড়) হাজারীবাগ জেলার অন্তর্গত ছোট্ট বসতি। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এর সর্বপ্রথম কয়লা-জনিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। সত্তর দশক এর প্রথম দিকের কথা। একটি ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশন ছিল। দিনে দুটিমাত্র ট্রেন আসত – রাত্রে কোলফিল্ড আর ভোরের দিকে রাঁচি-হাতিয়া এক্সপ্রেস। এছাড়া ছিল অনেক মালগাড়ি যেগুলি সারাদিন ধরে কয়লা বয়ে নিয়ে আসত। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আরেকটি উপায় ছিল হাজারীবাগ রোড। ছোট্ট একটি নদীর ধার দিয়ে আর ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাঁক নিত এই রাস্তা গিরিডির দিকে। বোকারোর বাসিন্দাদের মধ্যে সব প্রদেশের লোক ছিলেন, এবং বেশিরভাগ-ই কাজ করতেন বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে। শহরের প্রাণকেন্দ্র ছিল recreation ক্লাব। রোজ সন্ধেবেলা বাবা সেখানে যেতেন ব্রিজ খেলতে, আর আমরা দুই ভাই বোন স্কুল ছুটি থাকলে ব্যাডমিন্টন খেলতে যেতাম। বয়স তখন আমাদের সাত বা আট। মায়েরা যেতেন মঙ্গলবার হাউসি খেলতে। আমরাও শিখেছিলাম হাউসির ডাক দিতে। খেলার শেষে কাগজের স্লিপ গুলি যোগাড় করতে বড় আনন্দ হত।

আবহাওয়া ছিল কিছুটা আমেরিকার। মিড-ওয়েস্ট এর মত। হাড়-কাঁপানো শীত নয়তো কাঠফাটা গরম। বাবা আমাদের প্রথম শিখিয়েছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের কি সম্পর্ক। যেমন শিলাবৃষ্টি কাকে বলে - সে কি আনন্দ ছিল উঠোন থেকে শিলা কুড়োতে। শরতের আকাশ থাকত খুব স্বচ্ছ নীল আকাশ, কাশফুল আর শিউলি ফুলে যখন প্রকৃতি মেতে উঠত তার মানে ছিল পুজো এসে গেছে। পুজো মানে বন্ধুদের সঙ্গে হইচই করার পাঁচ পাঁচটা দিন। মা আর "কাকীমারা" ছেলেমেয়েদের জন্যে সেলাইকলে জামাকাপড় তৈরি করতে বসতেন একমাস আগে থেকে। সেও এক প্রতিযোগিতা – কার জামা কত সুন্দর হল। মা খুব বাহবা পেতেন নানা ধরনের ফ্রক বানাবার জন্য।

পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও দুটি ঘটনা। বাবা ও কাকুরা অমাবস্যার রাতে শিকারে বেরুতেন। কাপুর আঙ্কল সেই অঞ্চলের নামকরা শিকারি ছিলেন। তাঁর একটি এয়ার গান ও ছিল। বাবার কাজ ছিল তাঁকে বুলেট দিয়ে যাওয়া। নানারকম পাখি শিকার হত, এক দুবার চিতাবাঘ - ও শিকার হয়েছিল। পূর্ণিমার রাতে আমরা সবাই-মিলে কোনার নদীর তীরে চাঁদের আলোয়ে পিকনিক করতাম। জঙ্গল দেখাত মায়াবী, নদীর জল করত চিক চিক। আমরা সবাই গান ধরতাম "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে"। এর পরেই আসত দুর্গাপূজো।

প্রত্যেক পূজোর ছুটিতে আমরা কলকাতা যেতাম। যাবার কথা শুনেই মন নেচে উঠত। এই সময়ে ঠাকুমা কলকাতায় নিজের বাড়ি ফিরতেন। দিনগোনা সুরু হয়ে যেত আর তারিখটা ক্যালেন্ডার -এ লাল কালী দিয়ে দাগ দিয়ে রাখা হত। শুরু হত আমার ও ভাইয়ের কেনাকাটার লিস্ট তৈরি করা। আমার লিস্টে থাকত পুতুল, খেলার রান্নাবাটি, গল্পের বই। ভাই চাইত লাটাই, গুলতি, মার্বেল, জ্যামিতি বাক্স, আর কোনও এক গল্পের বইতে পড়া "ইলেকট্রিক চাবুক"। ভাই ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করেছিল "কলকাতায় ইলেকট্রিক চাবুক পাওয়া যাবে তো" ? ঠাকুমা এককোণে বসে জপ করছিলেন। ফোকলা দাঁতে হেসে বলেছিলেন "তুই কিসের কথা কস, কঞ্চি?" "পাওয়া যাবেখন কৃষ্ণনগরের মেলায়, তুই কঞ্চি দিয়া কি করবি?" ভাইয়ের উত্তর "তোমাকে জব্দ করব, মাছ খেতে আর বলবেনা তাহলে।"

মা একমাস আগে থেকে সুটকেস হোল্ডল নামিয়ে একটু করে গোছাতে থাকতেন। আমাদের ভীষণ আনন্দ হত। ঠাকুমা রবিবারের হাট থেকে দুটো কুঁজো কিনতেন। আমাদের সঙ্গে যেত। তার একটি উপহার দেওয়া হত ঠাকুমার বোনকে। এত ভালো কুঁজো নাকি কলকাতায় পাওয়া যেতনা।

এরকমই কলকাতা যাবার আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। যাবার দিন এসে গেছে। মা সব গুছিয়ে রেডি। দুটি কুঁজো যোগাড় হয়ে গেছে। এদিকে হোল্ডল গেল ছিঁড়ে। খোঁজ খোঁজ দড়ির। ছুটির দিন, কোনও দোকান খোলা নেই। বিপদ দেখে ভাই অমনি ফোন তুলে অপারেটর কে বললে "বৈজনাথ কো দো " বৈজনাথ আর রামাধীন ছিল তাবড় টেকনিশিয়ান। মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত এই লোকেরা পাওয়ার প্লান্ট চালাতেন দোর্দণ্ড প্রতাপে। কিছুক্ষণের মধ্যে রামাধীন এসে উপস্থিত। মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন "কি ব্যাপার তুমি এখন?" রামাধীন বলল "কেয়া করেগা মাইজি। ছোটা বাবু বোলা। আভি রসি লেকর ঘর পৌছাও" . বাবা তো রেগে অস্থির। রামাধীন দড়ি দিয়ে হোল্ডল বেঁধে ভাইয়ের গাল টিপে হাসতে হাসতে সাইকেল চেপে ফিরে গেল। তখনকার দিনের মানুষের সরলতা আর আনুগত্য আজও মনে দাগ কেটে

রেখেছে। যাক রসির ব্যবস্থা হলো, গোছগাছ শেষ, সন্ধেবেলা ড্রাইভার এসে স্টেশন পৌঁছে দেবে। ট্রেন রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ। সন্ধ্যে হতে না হতে মুরলী ড্রাইভার উপস্থিত। সে সাঁওতাল পরগনার লোক, মহুয়া খেয়ে বেহুশ, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল "স্যার, যখন বলবেন তখনই গাড়ি বার করব, বারোটা বললে যাব, একটা বললেও যাব। কিন্তু এখন রাত আটটার সময়ে যাবনা"। বাবা বুঝলেন নেশাগ্রস্ত মুরলী কে দিয়ে কাজ হবেনা। সবাই চিন্তিত, এই ছোট্ট সহরে আগে থেকে না বললে ড্রাইভার পাওয়া যায়না। অনেক ভাবনা চিন্তা করে ঠিক হলো আমরা হেঁটে চলে যাব স্টেশন। স্টেশন এক মাইল দুরে,তখন এইটুকু হাঁটা আমাদের কাছে কোনও ব্যাপার ছিলনা। সন্ধ্যে নামতেই চারিদিকে ঘন অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। বাবা মাথায় সুটকেস আর ঘাড়ে হোল্ডল নিয়ে রাস্তায় নামলেন। মা ধরলেন ঠাকুমার হাত। ভাই খিল খিল করে হেসে বলল "কুলী বাবা"। মার অমনি ধমক "ডেঁপোমি না করে তাড়াতাড়ি পা চালাও"। অগত্যা আমরা দুই ভাইবোন কুঁজো নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। নিঝুম শহর, আরও নিঝুম রাস্তা। মাঝে মাঝে রাস্তার আলোর হালকা রশ্মি চলার পথ দেখতে সাহায্য করছে। আমরা লাইন ধরে হাঁটতে থাকলাম। বাবা উৎসাহ দিতে লাগলেন, স্টেশন এ পৌঁছোতে পারলে, কালকে কাটাব কলকাতায়ে। প্রায় পৌঁছে গেছি এমন সময় দেখি দুরে একটি সাঁওতাল ছেলে হাপুস নয়নে কাঁদছে। আমরা কাছে গিয়ে তার ঝুড়ির দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে দেখলাম দুটি বাঘের বাচ্চা। বাবা জিগ্যেস করলেন "কোথায় পেলি"? সে বলল "সাহেব আমি মজদুরের কাজ করি, সকালে আসার সময় এই দুটি পেয়েছি। এই বাচ্চা গুলো নিয়ে গ্রামে ফিরলে, মা বাঘটা আমাকে মেরে ফেলতে পারে, তাই বসে আছি। আমরা খুব আদর করতে লাগলাম বাচ্চা গুলোকে, যেন দুটি বিড়ালছানা। বাবা ছেলেটিকে আশ্বস্ত করে বললেন, স্টেশন থেকে ফোন করে সব ব্যবস্থা করে দেবেন, করলেন-ও তাই। স্টেশন মাস্টারের ঘর থেকে অনেক গুলি ফোন করেছিলেন।

এর পর ট্রেন সময়মতই এলো, এবং আমরা কলকাতা চলে গেলাম। ছুটির পর আবার বোকারো ফিরলাম। ততদিনে বাঘের ছানা দুটো লালা আঙ্কল এর গ্যারেজ এ বাসা নিয়েছে। প্রত্যেক সন্ধ্যের সময় খেলা শেষ করে বাঘের ছানা দুটো না দেখে বাড়ি ফিরতামনা। কোনও এক আঙ্কল নাম রেখেছিল ঝুমরু আর ডুমরু।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। আমরা হোস্টেলে থাকি। ছুটি তে বাড়ি ফিরেই আগে ছুটেছিলাম লালা আঙ্কল এর ঘরে, কিন্তু বাঘের বাচ্চা দুটিকে দেখতে পাইনি। আঙ্কলের ঘর ছিল তালাবন্ধ। পড়শিরা বলেছিলেন ঝুমরু আর ডুমরু কে হাজারীবাগ চিফ ফরেস্ট অফিসার নিয়ে গেছেন। কিন্তু লালা আঙ্কল গেলেন কোথায় ? এর সঠিক উত্তর কারুর কাছেই পাইনি, প্রতিবেশীরা বলেছিলেন, আরে বাঘের বাচ্চা কখনও পোষ মানে? যে মনিব খাইয়ে দাইয়ে বড় করে, একটু বড় হয়ে তাকেই শেষ করে দেয় !

মন্টব্ল্যাংক

প্রভাত কুমার হাজরা

অনেক দিন আগে আমেরিকাতে এসেছিলাম। আসার আগে ঠিক করে এসেছিলাম যে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে ফিরে যাব। কিন্তু ঐ পরিকল্পিত সময়টি এতই দীর্ঘায়িত হয়ে গেল যে পরিকল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে তা মনে হয়না। শুধু তাই নয় আমার ফিরে যাবার যে কথা ছিল তাও ভুলে গেছি।

আমেরিকাতে আসার পরেই নূতন দেশে নূতন জীবন যাত্রার দ্রুত গতির সঙ্গে ছুটে চলতে হয়েছিল। পিছিয়ে পড়তাম তবু। পেছনে ফিরে তাকাবার অবকাশ পাইনি। আর আজ আমার সামনে পথ ক্ষীণ হতে চলেছে। সামনের দিকে পর্দাও ধীরে ধীরে নেমে এসেছে আমার চোখের সামনে আর মনের উপরেও।

বসে বসে ভাবি হয়ত আমার জীবন খাতায়, আমার জীবনের এক একটি ঘটনা কেউ লিখেছে এক একটি পাতায়। তারপরে সময় এগিয়ে গেছে। তার সঙ্গে পাতাগুলো ঝরে পড়েছে একটি একটি করে। আমি ইতিহাস রচনা করিনি তাই ঐ ঝরে পড়া পাতাগুলোর স্থান নেই ইতিহাসে। তবু ভাবি কি ছিল লেখা পাতা-গুলতে? কি ছিল আমার পুরাতন? তাই ক্লান্ত শৈথিল্যর অন্তরালে বসে বসে শুধু ভাবি আর ভাবি পুরাতন দিনের কথা।

ফিলাডালফিয়াতে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আজ আমি বসে আছি। পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঘরটিকে লালিমায় রাঙিয়ে তুলেছে। টেবিলের উপর দুই চারটি ছবির এলবাম পড়ে আছে। অনেকদিন খোলা হয়নি। তার পাশে আমার আঁকা দুই একটি পেনসিল স্কেচ। আর আমার আঁকা গঙ্গার বুকে সূর্যাস্তের একটি ছবি। ছেলেবেলায় এঁকেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমার ছবি আঁকার সখ। বাবা মা বলতেন পূর্বজন্মে আমি নিশ্চয় চিত্রশিল্পী ছিলাম।

সূর্যাস্তের ছবিটি হাতে তুলে নিয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। ভাবলাম এই সূর্য কত সহস্র কোটিবার উঠেছে আর অস্ত গেছে। পৃথিবীও নিজের অক্ষ-পথে ঘুরে চলেছে অনিবার। তার সঙ্গে আমিও ঘুরে চলেছি জন্ম থেকে জন্মান্তরে-- এক এক দেশে আর এক এক ভূমিকায়। তবু আমি সেই পুরাতন। আমার বিলুপ্ত পুরাতনের সঙ্গে আজও আমি বাঁধা আছি এক অদৃশ্য সেতু দিয়ে।

--- ২ ---

আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়াতে ছাত্র হয়ে ফিলাডেলফিয়া শহরে উঠেছি। আড়াইশো বছর আগে বেঞ্জামিন ফ্র্যাংলিনের প্রতিষ্ঠা করা এই ইউনিভার্সিটি খুবই বিখ্যাত। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আমার মত ছাত্র ছাত্রী এসেছে। তাদের স্বাগত জানিয়ে ক্যাম্পাসে প্রায় প্রতিদিন ছোটো খাটো অনুষ্ঠান। আনরা বিদেশী ছাত্র ছাত্রীরা দল বেঁধে লিবার্টি বেল, ইন্ডিপেন্ডেন্টস হল, ভ্যালি ফোর্জ যুদ্ধ ক্ষেত্র দেখে এলাম। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সব হচ্ছে পীঠ স্থান।

এই ভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল তারপর ক্লাস আরম্ভ হল। একদিন বিল বোর্ডে একটি নোটিশ দেখলাম। অপেশাদার ছাত্র ছাত্রীর আঁকা ছবি আর ফটোগ্রাফি দিয়ে একটি প্রদর্শনী হবে। দুই দিনের মধ্যে ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্টে ছবি জমা দেবার অনুরোধ করা হয়েছে। আত্মপ্রকাশের সুযোগ এত শীঘ্রই পাব তা আশা করিনি। আমার আঁকা সূর্যাস্তের ছবিটি হাতে নিয়ে ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্টে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম অফিসে একজন তরুণী বসে আছে। আমাকে অভ্যর্থনা করে বসতে বলল। আমার হাতে ছবি দেখে বুঝতে পারল আমি কেন গেছি। ওর নাম কেটি শাইন। ছবিটি হাতে নিয়ে ও নিখুঁত ভাবে দেখতে লাগল। ছবিটি কি বিষয়ে আঁকা হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে বললাম গঙ্গা নদীর উপরে সূর্যাস্তের ছবি। দেখলাম গঙ্গা নদী ভারত বাসীদের কাছে কত পবিত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস আর সংস্কৃতি ও ভাল করে জানে। এই সব নিয়ে ওর সঙ্গে কিছু আলোচনা করলাম। তারপর প্রদর্শনীতে দেখা হবে বলে আমি বিদায় নিলাম। কেটিকে বেশ ভাল লাগল। ও ভারী সুন্দর কথা বলে।

নির্দিষ্ট দিনে প্রদর্শনীতে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম কেটি আগেই এসেছে। দর্শকদের অভ্যর্থনা করছে। একটু পরে জানতে পারলাম প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের মধ্য কেটি একজন। ওর তোলা একটি ফোটোগ্রাফ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনী শেষ হবার পরে কেটির সঙ্গে একটু গল্প করলাম। এরপরে হাঁটতে হাঁটতে কেটিকে ওর ডরমিটরিতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। কেটি এই ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কেটির মা বংশপরম্পরায় আমেরিকান। ওর বাবা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে বুদাপেস্ট শহর থেকে এসেছিলেন। ধর্মে ওঁরা গোঁড়া ইহুদি। ওঁরা এখন নিউ ইয়র্কে থাকেন।

--- ৩ ---

কিছুদিন কেটে গেছে। কেটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ খাই। নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করি। প্রথমে ছবি আর ফটোগ্রাফি নিয়ে। তারপরে আলোচনা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সময় পেলে আমরা ফিলাডেলফিয়াতে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। গিমবেলস্, জন ওয়ানিমেকার, লিট্ ব্রাদারস এই সব দোকানে ঘুরে বেড়িয়েছি।আমেরিকার ঐশ্বর্য্য দেখে অবাক হয়ে গেছি। একদিন আমরা লংউডস্ গার্ডেনস বেদ গেছলাম। এত বড় আর এত সুন্দর বাগান এর আগে দেখিনি। কেটি একটা দামী ক্যামেরা এনেছিল। ওর বাবা আর মায়ের কাছ থেকে জন্মদিনের উপহার। ঐ দিন কত ছবিই না তুলেছিল কেটি। ছবি তোলা কেটির নেশা।

পড়াশুনার চাপ বেড়েছে। ক্লাসরুম আর লাইব্রেরীতে ছোটা ছুটি করে সময় চলে যায়। কেটিকে বিশেষ আর দেখিনা। তবুও মাঝে মাঝে লাঞ্চ খাবার সময় দেখা হয়। যেদিন দেখা হয় সেদিন গল্প করি। ভারী সুন্দর কথা বলে কেটি। যেদিন ও আসেনা, ও আসবে বলে ওর অপেক্ষায় বসে থাকি।

অক্টোবর মাস তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উত্তর দিক থেকে হেমন্তের বাতাস বইছে। স্প্রুশ আর পাইন গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। ইউনিভার্সিটির সামনে কলেজ হল। তার সামনে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের প্রতিমূর্তি। তার সামনে দিয়ে একদিন হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম দূরে কেটি মাটির উপরে বসে আছে। ঝরে পড়া পাতাগুলো নিয়ে খেলা করছে। ওর পাশে শুয়ে আছে এক তরুণ। হয়ত কেটির নতুন বন্ধু। আমাকে দেখতে পেয়ে কেটি হাত তুলে নাড়ল। আমি ওদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কেটি ওর বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কেটির বন্ধুর নাম ফ্রেড্রেরিক। দেখলাম ফ্রেড্রেরিক সুন্দর দেখতে। সোনালি চুল। বড় বড় চোখ। ভদ্র আর নম্র।

--- ৪ ---

দেখতে দেখত প্রায় দুমাস চলে গেল। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে ফল্ সেমেস্টার শেষ হবে। ঐ সময়ে ক্যাম্পাসে একটি নাচের অনুষ্ঠান হয়। সেই সময়ে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করার সুযোগ পায়। ঐ সূত্র ধরে অনেকেই বিয়ে করে। আমি ঐ ধরনের নাচে কখনও যাইনি। কৌতূহল হোল। মনে করলাম আমি একবার গিয়ে দেখে আসি। আমারও পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়লাম। ওয়ালনাট আর থার্টিথি স্ট্রীটে গার্লস ডরমেটরি। ওখানের তিন তলায় ফাংশন হলে নাচের অনুষ্ঠান। হলে ঢুকে দেখলাম তিল ধারণের স্থান নেই। ছাত্র ছাত্রীদের মনে আনন্দের ঢেউ বহে চলেছে। একটু পরে ব্যান্ড ইত্যাদি শুরু হোল। তারপরে নাচ। প্রথমে সব নাচ দ্রুত লয়ে। কেউ কেউ দ্বৈত ভাবে নাচছে। বাকী সব দল বেঁধে। তার পরে শুরু হোল অতি বিলম্বিত লয়ের নাচ। বেহালা আর ক্লেলিওনেটের সুর পরিবেশটিকে মায়া জালে বেঁধে রেখেছে। আমি নির্বাক স্বপ্নাবিষ্টের মত বসে আছি। এমন সময় দেখলাম ফ্রেড্রেরিক আর কেটিকে। ওরা দুজনে সুন্দর ভাবে সেজেছে। ফ্রেড্রেরিকের পরিধানে কালো টাক্সিডো। আর ঘন নীল রঙের জরি দিয়ে কাজ করা কেটির পোশাক। ওর মণিবন্ধে অর্কিডের কোরসাজ। কেটি অর্ধনিমীলিত চোখে ফ্রেড্রেরিকের কাঁধে মাথা রেখে নাচছে। ও আমাকে দেখতে পেল। একবার হাত তুলে নাড়ল। তারপর নাচতে নাচতে দূরে চলে গেল। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে তখন। আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

--- ৫ ---

তখন ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝা মাঝি। স্প্রিং সেমেস্টার আরম্ভ হয়েছে। পড়াশুনোর চাপ খুব বেশী। একদিন লাইব্রেরিতে গেছি। দেখলাম একটা ছোট টেবিলে বসে কেটি নোট লিখছে। আমাকে দেখে হাত তুলে নাড়ল। তারপরে আবার নোট লিখতে আরম্ভ করল। আমি দূরে একটা টেবিলে বই খাতা নিয়ে বসলাম। কিন্তু দেখলাম আমি কলম আনতে ভুলে গেছি। অগত্যা পেন্সিল দিয়ে নোট লিখতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু দেখলাম লিখতে অসুবিধে হচ্ছে। ভাবলাম কেটির কাছে একটা পেন থাকতে পারে। ওর কাছে এসে বললাম কি চাই। কেটি ওর পকেট-বুক থেকে একটা ফাউন্টেন পেন আমাকে দিল। আমার টেবিলে আমি ফিরে এলাম। পেনটা ভাল করে দেখলাম। ঘন সবুজ রঙে সূক্ষ্ম জরি দিয়ে কাজ করা একটা মন্টব্ল্যাংক ফাউন্টেন পেন। হল্ডার পিনের নিচে সোনালি রঙে খোদাই করা আছে "K" বুঝলাম ফেটির নামের প্রথম অক্ষর। পেনটা হয়ত ওর বাবা

মায়ের কাছ থেকে জন্মদিনের উপহার। পেনটা হাতের মধ্যে ধরে রাখলাম কিছুক্ষণ। কেটির হাতের স্পর্শ হাল্কা পারফিউমের সঙ্গে মিশে ছড়ানো আছে ফাউন্টেন-পেনটিতে। আমি নোট লিখতে আরম্ভ করলাম। সত্যিই এত সুন্দর পেন আমি কখনো ব্যাবহার করিনি। একটু পরে দেখলাম কেটি উঠে দাঁড়িয়েছে। অবিন্যস্ত চুলগুলি মাথার উপর সাজিয়ে নিচ্ছে। বুঝলাম ও ডরমেটরিতে ফিরে যাবে। পেনটা ফেরত দেবার জন্যে ওর কাছে গেলাম। ও বলল কলমটি কাল ফেরত দিলেই চলবে। ও আগামী সন্ধে সাতটার সময় আবার লাইব্রেরীতে আসবে। আমি আমার টেবিলে ফিরে এসে নোট লিখতে লাগলাম।

--- ৬---

পরের দিন ইউনিভার্সিটিতে এসে দেখলাম আমার বই খাতার ব্যাগের মধ্যে কেটির কলমটি নেই। আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমি কেটিকে কি বলব? হয়ত কেটি আমাকে বিশ্বাস করবে না। এর একটা সমাধান হতে পারে যে কলমটির দাম আমি কেটিকে দিয়ে দিই। কিন্তু টাকা নেবার মত মেয়ে কেটি নয়। তা ছাড়া জন্মদিনের উপহার টাকা দিয়ে মীমাংসা হয়না। আর একটা উপায় হতে পারে ঠিক কেটির কলমের মত আর একটি কলম কিনে দেওয়া। তা ছাড়া আর পথ নেই। ডিটিক হলের সামনে একটি দোকানে ঘড়ি ক্যামেরা আর নানা রকমের ফাউন্টেন পেন বিক্রি হয়। আমি ঐ দোকানে গেলাম। বললাম আমি কি কিনতে চাই। দোকানদার বলল ঐ ধরনের কলম ডাউন টাউনে বড় দোকান ছাড়া কেউ রাখেনা। ঐ কলমের দাম প্রায় দুশো ডলার। আমার হাতে সময় বেশী নেই। সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে লাইব্রেরীতে পৌঁছতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে ডাউন-টাউনে গেলাম। ফিলাডেলফিয়া সিটি হল পেরিয় ডানদিকে গিমবেলস ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। তার তিন তলায় অনেক ধরনের ফাউন্টেন পেন বিক্রি হয়। সেলস ম্যানকে বললাম কি ধরেন কলম কিনতে চাই। ও একটু অবাক হোল। এ রকম কলম বেশী বিক্রি হয়না বলে। যাই হোক দোকানদার আট দশ রকমের মন্টব্ল্যংক কলম দেখাল। তার মধ্যে একটি ঠিক কেটির কলমের মত। আমি ককিনে নিলাম। দাম একশো আশি ডলার। তখন বিকেল পাঁচটা। আমি ছুটে চললাম লাইব্রেরীর দিকে। ওখানে বই খাতা খুলে বসে থাকলাম কেটির অপেক্ষায়। ঠিক সময়ে কেটি এসে পৌঁছল। ওর সঙ্গে দুই একটি মামুলি কথা বলে কলমটি ফেরৎ দিলাম। কেটিকে ধন্যবাদ নিয়ে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি যেন কেটির কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাই।

---৭ ---

আজ ফিলাডেলফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে বসে মনে পড়ছে পূরণ দিনের কথা। সেই দিন যখন ফিলাডেলফিয়াতে এসে পৌঁছেছিলাম। এয়ারপোর্টে শিলা বৃষ্টি, লাগেজ হারিয়ে যাওয়া, বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকা, হোষ্ট ফ্যামিলির সাহায্যে এপার্টমেন্ট খুঁজে পাওয়া, চিত্র প্রদর্শনী, কেটির সঙ্গে বন্ধুত্ব। আরও অনেক কথা। কেটি এখন কোথায় আছে জানিনা। হয়ত ফ্রেড্রেরিকের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করছে।

অনেকদিন পরে কেটির ছবি দেখতে ইচ্ছে করল। একটা এ্যালবাম খুললাম। কেটির ছবি খুঁজে পেলাম। ছবিগুলি পুরোনো হয়ে গেছে…. রঙ উঠে গেছে। ভাল লাগলনা। তাই ওর একটা ছবি আঁকতে ইচ্ছে করল। রঙ আর তুলি আমার হারিয়ে গেছে অনেক দিন আগে। তাই একটা পেনসিল স্কেচ আঁকব ঠিক করলাম।

ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। কতক্ষণ সময় চলে গেল সে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছি। কোথায় আমি আছি সে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছি। মাথার মধ্যে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবু আমি ছবি এঁকে চললাম। মনের মধ্যে কেটির মুখচ্ছবি দ্রুত বদলে চলেছে। ছবি আঁকা শেষ হবার আগে আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম। এ কার ছবি এঁকেছি আমি? একটু পরে বুঝতে পারলাম এ তো মায়াবন্ধুলির ছবি। কত শত বছর আগে ওকে দেখেছিলাম তা মনে পড়ল না। তবু মনে পড়ল মায়া-বন্ধুলি ছিল আমার শিল্প-গুরু সুর্যসিংহের কন্যা এবং শিষ্যা। মনে পড়ল আমরা গুরু গৃহে থেকে শিক্ষা নিতাম। প্রথমে গুরু কন্যা মায়া-বন্ধুলি আমাদের শেখাত। কেমন করে রঙ মেশাতে হয়। মসৃণ অংশুপট্টের চিত্রলিপিতে কেমন করে তুলির আঁচড় টানতে হয়, এই সব প্রাথমিক জিনিসগুলি মায়া-বন্ধুলির কাছে শিখে ছিলাম।

সূর্য-সিংহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আগেও আমি ছবি আঁকতাম। সে সময়ে শিল্পীরা দেব দেবীর ছবি আঁকত। সামিও তাই করতাম। আমার সুনাম ছিল। আমার আঁকা ছবি ভালই বিক্রি হত। কিন্তু ক্রেতারা ধর্মের চোখ দিয়ে ছবির মান বিচার করত। আমার ভাল লাগতনা। আমি সৌন্দর্যের পূজারী।

আমি যে ধরনের ছবি আঁকতে চাই তা শেখাবার গুরু সূর্য-সিংহ ছাড়া আর কেউ ছিলনা। কিন্তু সূর্যসিংহের শিষ্যত্ব সহজে পাওয়া যায়না। আমাদের দেশের রাজা আঙ্গারপর্ণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তার পুত্র অচিরাংশু সূর্য সিংহের গৃহে থেকে শিক্ষা নিয়েছে। তার সুপারিশে সূর্যসিংহ আমাকে গ্রহণ করেছিলেন।

দুই বছর ধরে মায়াবন্ধুলির কাছে শিল্পকলা নতুন করে শিখলাম। তারপরে সূর্য-সিংহ আমাদের শেখাতে আরম্ভ করলেন। মায়াবন্ধুওলি মাঝে মাঝে এসে যোগ দিত। যেদিন ও আসত আমার মন ভরে যেত। যেদিন আসত না, ওর পথ চেয়ে বসে থাকতাম। একদিন বুঝতে পারলাম আমার শিল্পচর্চা আর মায়াবন্ধুলি একেবারে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। আমার মানস চোখে

মায়াবন্ধুলিকে বসিয়ে রেখে ওর ছবি আঁকতাম। অন্য ছবি আঁকার জন্যে শিল্পাচার্য যে রঙ দিতেন তা সব ফুরিয়ে যেত, তবু আমি মায়াবন্ধুলির ছবি আঁকতাম। ভাবতাম মায়াবন্ধুলির বন্দনায় আমার শিল্প-সাধনা সার্থক হোক। কিন্তু আমার শিল্প-সাধনা কেন সব কিছুই যে চুরমার হতে চলেছে তা আমি জানতাম-না।

সূর্যসিংহ একদিন রাজা অঙ্গারপর্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ফিরে এসে বন্ধু বান্ধবদের কাছে একটি শুভ খবর দিলেন। মায়াবন্ধুলির সঙ্গে অচিরাংশুর বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে। আমার চোখের সামনে সব আলো নিভে গেল। মনের উদ্যম শেষ হয়ে গেল। যে উৎস থেকে শিল্প-সৌন্দর্য আমার মনে বহে এসেছে তা বন্ধ হতে চলেছে। একবার ভাবলাম আমি ফিরে যাই। আবার ভাবলাম আমি শিল্পী। আমার মনের দুর্বলতা আর আবেগ আমার শিল্প-সাধনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। আমি থেকে গেলাম। বিয়ের দিন ঠিক হবার পরে মায়াবন্ধুলিকে দেখতে পাই না। তবুও ওকে দেখতে ইচ্ছে করে। এমনি করে একটির পর একটি দিন চলে গেল।

---৮---

আজ মায়বন্ধুলির বিয়ে। শিল্পাচার্য সুর্যসিংহের গৃহ আনন্দ-উৎসবে মুখর। গৃহের সামনে একটি বেদীর উপরে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন। তার সামনে অতিথিরা আসন গ্রহণ করেছে। বিবাহ বাসর আলোয় ঝল্ মল্ করছে। কুমার অচিরাংশু বর বেশে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত হল। শাঁখ আর উলুধ্বনি ওকে বরণ করল। তারপর পিতা সূর্যসিংহের হাত ধরে মায়াবন্ধুলি বেদীর দিকে এগিয়ে চলল। ওর পরিধানে লাল চেলি। ললাটে শ্বেত চন্দনের চিত্রলেখা। বাহুতে কনক কেউর। মণিবন্ধে কুসম বলয়। ওকে আজ নূতন রূপে দেখলাম। নিভৃতে বসে ওর কত ছবি এঁকেছি। তবু মন ভরেনি। আমার মনের গহনে ওর যে রূপটি লুকিয়ে ছিল সেই রূপে আজ ওকে দেখলাম।

মায়াবন্ধুলি বেদীর দিকে এগিয়ে চলল। আমার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকারে ডুবে গেল। আমি আর স্থির থাকতে পারলামনা। এখান থেকে পালিয়ে না গেলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব। আমি ছুটে গিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। আমার জিনিষ পত্র বেঁধে নিলাম। এখন রওনা হলে কাল সকালের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব। শিল্পাচার্যের অন্দরমহলের দিকে আর একটি দরজা। ঐ পথে বেরিয়ে গেলে আমাকে কেউ লক্ষ করবে না। আমি ঐ দিকে এগিয়ে চললাম। দেখলাম অন্দরমহলে একটি ঘর সুন্দরভাবে সাজান। বুঝলাম বাসর ঘর। শয়নশয্যায় ফুলের স্তবক। বাজুতে যুঁই আর রজনীগন্ধার মালা। ঘরের ভেতর থেকে অগুরুর গন্ধ ভেসে আসছে। সারা বাড়ি জনপ্রাণী-হীন। আমি তখন সম্পূর্ণ অপ্রকৃস্থিত। ন্যায় অন্যায় জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলেছি। আমি বাসর ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম দুটি প্রদীপ জ্বলছে। নব দম্পতীকে স্বাগত জানাবার অপেক্ষায়। একটি প্রদীপ হাতে তুলে নিলাম। দেখলাম একটি দেওয়ালে মায়াবন্ধুলির ছবি টাঙানো আছে। স্বল্প আলো। তবু বুঝতে পারলাম ছবি সূর্যসিংহের আঁকা। সূর্যসিংহের শিল্পনৈপুণ্য চিনতে আমার ভুল হয়না। দেখলাম একটি তাকের উপর সাজান আছে মায়াবন্ধুলির ছবি আঁকার সরঞ্জাম। রঙ আর অনেকগুলি তুলি। তার মধ্যে যে হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরি একটি তুলি। ঐ তুলি মায়াবন্ধুলি অধিকাংশ সময়ই ব্যবহার করত। মাঝে মাঝে আনমনে বসে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকত। তুলি ওর কোলে পড়ে থাকত। চুলের মধ্যে তুলি গুঁজে গুন গুন করে গান গাইত আর রঙ মেশাত। আমি আর স্থির থাকতে পারলামনা। তুলিটি হাতে তুলে নিয়ে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। যে দিকে চোখ যায় সে দিকে ছুটে চললাম। বিবাহ আসরের নহবত তখনও শুনতে পাচ্ছি দূর থেকে। একটু পরে নহবতের সুর থেমে গেল। আমার শিল্প-শিক্ষাও থেমে গেল মধ্য পথে। আমি ছুটে

চললাম। পরের দিন আমি বাড়ি পৌঁছলাম। কিছু দিন আত্মগোপন করে থাকলাম। নিজেকে ধিক্কার দিলাম। আমি শঠ, আমি চোর, আমি শিল্পভ্রষ্ঠ। কিছুদিন পরে আবার ছবি আঁকতে আরম্ভ করলাম। দেব দেবীর ছবি যেমন আগে আঁকতাম। কিন্তু ছবিতে তাদের মুখচ্ছবি বদলে গেছল। তাই আমার ছবি কেউ আর কিনতে চাইত না। তারপরে আমার জীবন কেমন করে কেটেছিল তা এখন মনে পড়ে না।

----৯---

আমি সেই ব্যর্থ শিল্প সাধক। শত শত বছর আগে শিল্পাচার্যের গৃহ ত্যাগ করেছিলাম। তারপরে জীবন পরিক্রমায় ঘুরতে ঘুরতে আজ আমি আমার ফিলাডেলফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে বসে আছি। একটু আগে সূর্য ডুবে গেছে। আমার অতীত জীবনের ছবিটিও মনের মধ্যে ফুটে উঠে ডুবে গেল। আমি আলো জ্বেলে দিলাম। পেনসিল স্কেচে আঁকা মায়াবন্ধুলির ছবিটির দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলাম ছবিতে দুই একটি রেখা ভাল করে আঁকা হয়নি। ঐ রেখাগুলি রঙ আর তুলি দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু রঙ আর তুলি আমার হারিয়ে গেছে অনেক দিন আগে। কালি আর কলম ছাড়া উপায় নেই। টেবিলের উপর কলম খুঁজে পেলামনা। টেবিলের ড্রয়ার খুললাম। পুরোনো খৃস্ট-মাস কার্ড। দেশ থেকে বন্ধুদের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। তার সঙ্গে একটি ছোট খামে পুজোর ফুল। এখানে আসবার সময় মা দিয়েছিলেন। সব সময় কাছে রাখতে বলে ছিলেন। আমার চোখ জলে ভিজে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। তারপরে ড্রয়ার থেকে আরও কাগজ টেনে বার করলাম। দেখলাম ড্রয়ারের এক কোনে একটা কলম পড়ে আছে। তার উপর ধূলার পরিমাণ দেখে বোঝা যায় কলমটি কতদিন পড়ে আছে ওখানে। কলমটি হাতে তুলে নিলাম। দেখলাম ঘন সবুজ রঙের একটি মন্টব্লাংক কলম। সূক্ষ্ম সোনালী রেখায় কাজ করা। কলমের হোল্ডার পিনের ঠিক নিচে সোনালী রঙে খোদাই করা আছে "K"

মানুষের আয়ুষ্কাল

অনাবিল সিদ্ধান্ত

ঈশ্বর মানুষ তৈরি করার আগে গাধা,কুকুর এবং বাঁদর তৈরি করেছিলেন। আসলে তিনি নানান রকম জীবজন্তু তৈরি করে হাত পাকাচ্ছিলেন যাতে তিনি তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মানুষ তৈরি করতে পারেন, যে মানুষ হবে অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

গাধা তৈরি করে ঈশ্বর তাকে বললো, "তোমাকে আমি বুদ্ধি দিলাম না। তোমার কাজ হবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পিঠে করে ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া। তুমি ঘাস খাবে। সুরের জগতের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক থাকবে। তোমার নামটিও হবে বেশ সুরেলা। তৃতীয় সুর 'গা' এবং ষষ্ঠ সুর 'ধা' সহযোগে তোমার নাম হবে 'গাধা'। তোমার আয়ুষ্কাল হবে পঞ্চাশ বছর। তোমার গলায় সুর না থাকলেও জোর থাকবে। বুদ্ধি না থাকায়, কোনো টেনশনও থাকবে না। তোমার যদি কোনো কিছু বলার থাকে তো বলতে পারো।"

গাধা বললো, 'গাধার জীবন যাপন না করে কী করে বলবো এ জীবন আমার কাছে কতটা সুখের হবে। তবে, ৫০ বছর ধরে ভারবাহী থাকাটা খুব সুখের হবে না তা অনুমান করতে পারি। তাই আমার প্রস্তাব আমাকে মাত্র ২০ বছর আয়ু দিন। আমাদের আয়ুর বাকি ৩০ বছর আপনি ইচ্ছামতো অন্যকে দিয়ে দিতে পারেন।'

ঈশ্বর বললেন, 'তথাস্তু'। ২০ বছর আয়ুষ্কাল নিয়ে তুষ্ট গর্দভ কান নাড়াতে নাড়াতে চলে গেল।

এর পর ঈশ্বর, কুকুর তৈরি করলেন। সদ্যজাত সারমেয়কে ঈশ্বর সস্নেহে বললেন, 'বৎস, তুমি মানুষের বাড়ি দেখাশুনো করবে। তুমি প্রভু-ভক্ত হবে। প্রভু যা খেতে দেবে তুমি তাই খাবে। তুমি ৩০ বছর বাঁচবে। '

কুকুর বললো, ' না প্রভু, আমি এতদিন বাঁচতে চাই না। আমাকে ১০ বছর পরমায়ু দিন। তাতেই হবে।বাকি ২০ বছর আপনি আপনার ইচ্ছামতো অন্য কোনো প্রাণীকে দিয়ে দিতে পারেন।'

ঈশ্বর বললেন, 'তথাস্তু।'

এরপর ঈশ্বর বাঁদর তৈরি করলেন, ঈশ্বর তাকে বললেন, 'তুমি এক শাখা থেকে লাফিয়ে অন্য শাখায় যাবে। বাঁদরামো করবে। তোমার লম্ফঝম্প অপরের বিনোদনের কারণ হবে। এরপর আমি মানুষ তৈরি করবো। তোমার বাঁদরামো দেখে মানবশিশুরা আনন্দ পাবে। তুমি বাঁচবে ২০ বছর।'

বাঁদর বললো, 'ঈশ্বর, আমার ২০ বছরের আয়ু চাই না। ১০ বছরই যথেষ্ট। আমার জীবনের বাকি ১০ বছর আপনি যাকে খুশি দিয়ে দিতে পারেন।'

ঈশ্বর বললেন, 'তথাস্তু।'

এর পর ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাকে বললেন, "তুমি মানুষ। তুমি জগতের একমাত্র বুদ্ধিমান জীব। তুমি অন্য প্রাণীদের ওপর প্রভুত্ব করতে পারবে এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে সেরা বলে গণ্য হবে। তুমি ২০ বছর বাঁচবে।'

মানুষ বললো, 'আপনি আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাকে তৈরি করেছেন। জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। কাজেই এমন জীবন মাত্র ২০ বছরে শেষ হয়ে যাবে তা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাকে আরও দীর্ঘ জীবন দিন।'

ঈশ্বর একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দেখ, অন্য প্রাণীদের মধ্যে অনেকে তাদের আয়ুর একাংশ ছেড়ে দিয়েছে। কাজেই, আমার হাতে কিছু বাড়তি আয়ু আছে। গাধার আয়ুর ৩০ বছর, কুকুরের আয়ুর ২০ বছর, আর বাঁদরের আয়ুর ১০ বছর আমার হাতে উদ্বৃত্ত আছে। ইচ্ছে করলে তুমি তা নিতে পারো।'

মানুষ বললো, 'আমি আপনার হাতের উদ্বৃত্ত আয়ুর পুরোটাই নিতে চাই।'

ঈশ্বর বললেন, 'তথাস্তু।' গাধার আয়ুর ৩০ বছর,কুকুরের আয়ুর ২০ বছর এবং বাঁদরের আয়ুর ১০ বছরও তোমাকে দিয়ে দিলাম। এতে মানুষের আয়ু দাঁড়াল ৮০ বছর।'

এর পর থেকে মানুষ ২০ বছর মানুষের মতো থাকে, প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর ৩০ বছর গাধার মতো কাজ করে এবং নানান সাংসারিক বোঝা বহন করে। যখন ছেলেরা কর্মসূত্রে বা অন্য কোনো কারণে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন ২০ বছর কুকুরের মতো বাড়ি পাহারা দেয়। যা খেতে দেয় তাই খায়। এরপর এক ছেলের বাড়ি থেকে অন্য ছেলের বাড়িতে লাফিয়ে যাওয়া – বাঁদরেরা যেমন এক শাখা থেকে লাফিয়ে অন্য শাখায় যায়, নাতি-নাতনিদের হাসানোর জন্য অনেক অসঙ্গত আচরণ করে।

যোগ সাধনার দ্বারা জাগৃতি বা ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ

অমল শাস্ত্রী

ধ্যানযোগ (*meditation*) দ্বারা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন অবস্থার প্রাপ্তি , এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় প্রকাশের অনুভূতির দ্বারাই, ভৌতিক জগতে পুনঃ জন্ম না নিয়ে, ঈশ্বরের সাথে, যুক্তাবস্থার প্রাপ্তি, এই লক্ষ স্থির।তাই প্রার্থনা করি, হয়ত কিছুই নাহি পাব, তবু হে ঈশ্বর, তোমার দিব্য-জ্যোতির প্রকাশে, সর্ব-মানবের কল্যাণ হোক, এই প্রার্থনা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লিখে যাব।নিশ্চয়ই কোন একদিন, *turning point* বা মোড় ছাড়বে, সেদিন সব-কিছু ত্যাগ করে, এবং ভুলে, কেবল মাত্র যোগ-সাধনা (*union with god*) দ্বারা, শুধু মাত্র চোখ বন্ধ করে, ঈশ্বরের প্রকৃত অনুভূতি অনুভব করবো(*perceptibility of god, not by action or ritual*). ভগবান যেদিন বহিঃ-চোখ বন্ধ করে দেবেন, সেদিন অন্তর-চক্ষুও বন্ধ হয়ে যাবে, তাই পূর্ণ-রূপে বন্ধ হবার আগে , বর্হিচক্ষু বন্ধ করে, অন্তর-চক্ষু,…… ঈশ্বর উপলব্ধির উপায়।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক, যে, যথা মাম প্রপদণ্ডে; তাম স্তুতিব, ভজামহ্যম—যে আমাকে যে ভাবে পুজো করে, আমি তাকে সেই প্রকার আশীর্বাদ দিই। এর গূঢ় অর্থ হল এই, যে পাথরের বা পুতুলের পুজো(আমাকে মনে করে), শিশুর মতন তাকে খাবার-পড়ার চাই এবং কিছু দৈহিক ও মানসিক আনন্দ। আমি তাকে সেই প্রকার ফল প্রদান করি। যে দেবতা নয় , তাকে সীমাবদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা, কল্পনার জগতে বিচরণ করে, নিজেকে বোকা বানাই, তার জন্য কি ঈশ্বর দায়ী ?

আমি কি চিরদিন শিশুর মতন , *1st standard* এ থাকবো ? প্রাথমিক অবস্থাতেই ? আমার ভিতর যে পরমাত্মার অংশ বিরাজমান , তার অনুভূতি না করে কতদিন আর পুতুল খেলা খেলবো ? শেষ-দিন আসতে আর কত বাকী ? আমার আত্মার ক্রন্দনের(মুক্তির) ভাষা, কবে বুঝতে চাইবো ? একবার চোখ বন্ধ করে, ঐ অনন্তের অংশরূপ আত্মা নিরাস্থব্ধ(*silently*), সবার অজান্তে আমাকে চালাচ্ছে। তার ইচ্ছে একবার উপলব্ধি করার চেষ্টাতো করি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চাই, চাই এবং নাই-নাই চলছে এবং চলবে। আমার প্রকৃত চালক তার ভাষার অনুভূতি করে, ঐ পরমপুরুষের পরমাত্মা যে আমাকে অ-দৃশ্যরূপে, এবং এই জগত-সংসার চালাচ্ছে, তার সঙ্গে একবার মিলনের স্থিতি হোক।

দেখা গেছে, ঈশ্বর-মিলনের পর বর্হী-জগতের পূজা, গান, ও শব্দ রুদ্ধ হয়ে যায়। *Divine Energy* কখনও নষ্ট হয়না। সুতরাং আত্মার উপর নতুন কোন আবরণের কি প্রয়োজন আছে ? এই শরীরও নষ্ট হয়ে যাবে, পরমাত্মার অংশরূপী আত্মা, ঐ পরম-শক্তির সঙ্গে মিলে যাবে, যদি আমি আত্মার উপরের কামনা বাসনা, আশা –আকাঙ্ক্ষার আবরণ মুক্ত হতে, ঈশ্বরীয় দিব্য-জ্যোতির-প্রকাশের সাহায্য নিই। নতুবা , পুনঃ অপি রূপ-নম্, পুনঃ অপি-মরণম্। *Again and again in Birth Circle.*

আমি গম্ভীর এবং গভীর ভাবে চিন্তা করবো যে, এই জীবনের সমস্যার মূল কারণ কি ? এবং তার নিবারণ কি ? জীবনের সুখ , স্বাচ্ছন্দ্যই কি একমাত্র সমস্যা ? কিছু লোক পয়সা রোজগার করে, বেশ কিছু লোক পুঁথি-গত বিদ্যা আহরণ করে, কিছু লোক মান-সম্মান ইত্যাদি দিয়ে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঈশ্বরীয় বা অনন্তের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। কেন ভগবান আমাকে দেহ, মন, ও বুদ্ধি দিয়েছেন। কাকে অজ্ঞানী, প্রজ্ঞানী, এবং বিজ্ঞানী বলে ? অজ্ঞানী হল সেই শিশু, যে ভৌতিক জগতের কিছুই জানতে পারেনা। প্রজ্ঞানী হল সেই, যে অন্যের লেখা পড়ে ও মুখস্থ করে, ভাল লেকচার দেয় এবং বই লেখে, যা সবই ভৌতিক জগতের কথা। বিজ্ঞানী, সেও অন্যের বই *refer* করে, কিছু লেখে, তবে ভৌতিক জ্ঞানই বলে ও লেখে। গীতার ভাষায় আরও দুটি শব্দ আছে, তা হল অজ্ঞ, এবং প্রাজ্ঞ। অজ্ঞ ঈশ্বরীয় ভাষায় যে ঈশ্বরকে জানতে, বুঝতে বা উপলব্ধি করতে চায়না।প্রাজ্ঞ হলেন সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বর অনুভূতি বা উপলব্ধি ছাড়া অন্য কোনও বিষয় সম্বন্ধে বুঝতে চায়ও না এবং পারে না।

অনেক কিছু পড়ে, জেনে আমার ঈশ্বর অনুভূতি আজ পর্যন্ত হয়েছে কি ? কতদিন আর অলীকের জগতে থেকে নিজেকে সান্ত্বনা দেবো যে , আমি যা করে চলেছি তা ঠিক ? ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন-অবস্থা না হলে আমার এই মনুষ্য জন্ম বৃথা। এই দেহ, কোটি যোনী, বহু জন্তু জানোয়ার রূপ বদলের পর, মনুষ্য দেহ পেয়েছি। "অহো ! ভাগ্য !" এই মানব দেহ। মন, বুদ্ধি, শরীর দ্বারা গঠিত , গর্বিত এই জন্মেই, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে, নিজেকে কেন বঞ্চিত করবো? আদেশ উপদেশ ও জ্ঞান তো পড়ে ও জেনে, আমার পরিবর্তন কেন হলোনা ? কে আমাকে ঈশ্বর অনুভূতি দ্বারা জগত-বন্ধন থেকে মুক্ত করে, ঈশ্বর-মিলন করে দেবে ? যেদিন মহা-প্রলয় হবে, একদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে, সব জীবাত্মার আত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবে। কেন আমি সেই প্রলয়ের দিন পর্যন্ত, পুনরায় বিভিন্ন যোনীতে জন্মগ্রহণ করে, প্রকৃতির যন্ত্রণা, জ্বালা, দুঃখ, কষ্ট, রোগ-ভোগের জন্য, মূর্খের মতন চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকবো ? ধর্ম-পুস্তক, পূজো-পার্বণ, গান, ইত্যাদি মানসিক পরিবর্তন আনে যা ক্ষণিক বা ক্ষণ-ভঙ্গুর। মরীচিকার পিছনে দৌড়তে, দৌড়তে, একদিন মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে পৌঁছে , কেউ রাম-নাম, হরিবোল, বা গীতা-পাঠ করবে, যখন আমিই নেই, দেহ আছে। তাই অন্য সৎ-উপায় থাকা ষত্বেও, তার সৎ-ব্যবহার না করে, শেষ দিনের জন্য বসে থাকবো ?

যেদিন, এই পৃথিবীতে, কোন দেহ বা শরীর রূপ সৃষ্টি হয়নি, সেইদিন শুধু একমাত্র, পরম-সুক্ষ্ম-পরমাত্মাই বিরাজমান ছিলেন। ঈশ্বরের রূপ রস গন্ধ সমগ্রের বর্ণনা করে ভজন করার জন্য, দেহ জড়িত আত্মাও ছিলনা। কাল চক্রের গতির সঙ্গে সঙ্গে, একদিন, ঐ পরম সুক্ষ্মের এক অংশ আত্মা রূপে এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হল। সুক্ষ্ম আত্মার উপর জগতের বিভিন্ন প্রকারের আবরণ দিয়ে এক জড় পিণ্ডের সৃষ্টি। তারপর ধীরে ধীরে সেই জড়পিণ্ডতে দেহ মন চিত্ত বুদ্ধি এবং অহংকারের অশুদ্ধ সরূপ, প্রবেশের ফলে, আজকের বর্তমান স্থূল-দেহ-রূপ ধারণ এবং পরিণামে সদ্ গুন এবং দূর্গুন যুক্তাবস্থায়, এই শরীরের দেহে, সংসারের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শোক, প্রেম ইত্যাদির সংযোগে, পছন্দ, অপছন্দ, ভাল-লাগা ও ভাল-না লাগা, ইত্যাদি সুন্দর ভাবে মিশ্রিত হলো। এই সব ভৌতিক সংমিশ্রণে, মানবের দেহে বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হল।

আমার এই দেহ ধারনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি ? দৃষ্টিবিন্দু অতি সংকুচিত করে, কোনদিন সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারেনা। এই দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদির মূল কারণ কি এবং কে? তাহল, আমার এই শরীর বা দেহ। আমি সেই সাধনাই করবো, যাতে আমাকে এই মর-দেহ ধারন আর না করতে হয়।

ভক্তি হল সাধনার এক অঙ্গ। মোক্ষ বা মুক্তি হোল, আধ্যাত্মিক জগতের প্রাথমিক অবস্থা। এই স্থিতি হল ঈশ্বরের জগতে প্রথম পদক্ষেপ। ঈশ্বর মানবকে তিনটি রত্ন দিয়েছেন; দেহ, মন, এবং বুদ্ধি। তিনটি রত্ন ঈশ্বরীয় এবং ভৌতিক জগতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কর্তব্য, গীতাতে এই প্রসঙ্গে নিষ্কাম কর্মের উল্লেখ আছে।

ঈশ্বর শূন্য, ঈশ্বর কোন বন্ধনে নেই। কোন রূপ বা বন্ধনের দ্বারা ঈশ্বরীয় স্থিতি বা ঈশ্বর-অনুভূতি কোনদিন সম্ভব হতে পারেনা। অসীমকে সীমাবদ্ধে বাঁধার চিন্তা ভাবনা ইত্যাদি হল নিজেকেও সীমার বন্ধনে আবদ্ধ করা। অসীমকে অসীমতার দ্বারাই অনুভূতি সম্ভব ···অসীমের দ্বারা অসীমের উপাসনা বা প্রাপ্তি।

ইশ উপনিষদে আছে, "তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতম, তত্তে পর্য্যায়"। হে পরমেশ্বর তোমার কল্যাণময় সরূপ, তোমার অনুগ্রহ অর্থাৎ তোমার দিব্য-ধারায়, আমি (জীবাত্মা), অনুভূতি করছি। আমিই ঐ সুর্য্য-মন্ডলের আত্ম-পুরুষ।

কঠ-উপনিষদ বলছে "যৎ বিজ্ঞানবান্ ভবত্য-মনস্করঃ সদাশুচি"। যে অবিবেকী, অসমাহিত চিত্ত, তারাই অশুচি, তাদের ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি হয়না বলেই, তাদের সংসারে মতি এবং গতি লাভ করে, চিরজীবন সংসারীই থাকেন।

যোগ-সাধনার দ্বারা, ঈশ্বর অনুভূতির ফল সরূপ, জীবাত্মা অনন্তের উপলব্ধি করে। কুটস্থ স্থিতিতে যে শ্বেত-জ্যোতির্ময় দিব্য-ধারার প্রকাশ হয় তা তখন সর্বত্রই প্রতিভাত হয়।স্থির-চিত্তে চেতনার দ্বারা চৈতন্যতার উপলব্ধি। অস্থির চিত্তে, চিরদিনের মতো চেতনার অভাব।

শ্রী কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও রাখিবন্ধন

নীলিমা চক্রবর্তী

বৈষ্ণব ধর্ম সজীবতার ধর্ম। ভক্তের ভক্তি রসসিক্ত, প্রেমময়, জীবনময়। কৃষ্ণের বন্দনায় তা রসময়। আর জগদীশ্বর কৃষ্ণের বছরের তিনটি পূর্ণিমায় তিনটি লীলা হয়। দোল- পূর্ণিমায় দোলযাত্রা, বর্ষায় ঝুলন-পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রা এবং রাস- পূর্ণিমায় রাসযাত্রা।

ব্রজ মণ্ডলে কৃষ্ণের বন্দনা গেয়ে ঝুলনযাত্রা বা হিন্দোল লীলা প্রচলিত। সাধারণত শ্রাবণ মাসের একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব পালিত হয়। শ্রাবণী পূর্ণিমা হল রাখি পূর্ণিমা। তাই এই তিথিতেই রাখির মাধ্যমে মানব-মিলনের বন্ধন পালিত হয়।

শ্রাবণের পূর্ণিমায় শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের ঝুলন লীলা বাস্তব বুদ্ধিতে বোঝা যায় না, দর্শনও করা যায় না। এই লীলা পূর্ণতম প্রেম লীলা। এই লীলা ভক্তের অন্তরেই থাকে। কেবল বাহ্যিক আনন্দ উপভোগের জন্য ঝুলন উৎসবের লৌকিক আয়োজন। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই নতুন রসভাবযুক্ত হয়ে স্বীয় ভক্তগণের আত্মাতেও রমণ করেন। ইহলোকে বা পরলোকে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। অন্যরা সকলেই প্রকৃতি। অপূর্ণ মানবকে প্রেম-সুধা পান করিয়ে নিবৃত্তির পথে নিয়ে যাওয়াই এই ব্রজলীলার বৈশিষ্ট্য।

রাখি বন্ধন বৈষম্য ও অনৈতিকতাকে দূরে সরিয়ে মানুষের মনে ভ্রাতৃত্ব-বোধ ও প্রীতির বন্ধনকে আজও উদ্দীপ্ত করে আসছে। পৌরাণিক মতে অসুরদের দ্বারা স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হলেন। তখন দেবগুরুর পরামর্শে ইন্দ্রপত্নী শ্রাবণী পূর্ণিমায় দেবরাজের হাতে বেঁধে দিলেন রক্ষাকবচ স্বরূপ একগুচ্ছ রাখি। এরপর দেবগণ স্বর্গরাজ্য উদ্ধারে সমর্থ হলেন। ব্রজের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের হাতে কোমল ফুলের রাখি বেঁধে দেয় প্রীতি ও উল্লাস ময় চিত্তে। আমাদের মধ্যে এই রাখি বন্ধন শুধুমাত্র ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্কে সীমাবদ্ধ। শোনা যায় এক রাজপুত কন্যা দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনকে ভাই পাতানোর স্বীকৃতি হিসাবে প্রত্যেক বছর রাখি পাঠাতেন। যখন রাজকুমারী রাজ্য বাঁচাতে প্রচণ্ড যুদ্ধে বাহাদুর শাহের কাছে পরাজিত হয়ে ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়লেন, তখনও তিনি এই সীমাহীন দুঃখের মধ্যে রাজবাড়িতে ফিরে এসে দিল্লীর সম্রাটের নিকট রাখি পাঠাতে ভোলেন নি। কারণ সেইদিন ছিল রক্ষাবন্ধন উৎস। সম্রাট এই ভ্রাতৃ বন্ধনের রাখি পাওয়া মাত্র ভগিনীর সম্মান রক্ষার্থে তখনই অস্ত্র সজ্জিত হয়ে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেন। কিন্তু রাজপুরীতে গিয়ে শুনলেন, কুলমর্যাদা, সতীত্ব ধর্মনাশ থেকে বাঁচতে রাজকুমারী অগ্নিশিখায় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। তখন সম্রাট মর্মবেদনায় অস্থির হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকলেন।

আবার লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দেশপ্রেমের মন্ত্রে জাতীয়তা-বোধকে উদ্বুদ্ধ করতে আপামর জন সাধারণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে জাতী-ধর্ম নির্বিশেষে রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্রে শপথ নিয়েছিলেন ৩০আশ্বিনের পুণ্য প্রভাতে।

তাই ঝুলন-পূর্ণিমা বা রাখি উৎসব এক অর্থ বহন করছে। দিনটি জাতীয় সংস্কৃতি দিবস রূপেও চিহ্নিত।এই রাখিবন্ধনের ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে এক সুন্দর স্বচ্ছ পরিমণ্ডল।

ওঙ্কার-ধাম দর্শন

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

ভারতবর্ষ মন্দিরে ভরা দেশ, কত অপরূপ স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন ভারত-জুড়ে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা সারা পৃথিবীর একটি সর্বোত্তম এবং সুবিখ্যাত মন্দির-পুঞ্জকে খুঁজে পাওয়া যায় এই উপমহাদেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দুরে সুদূর ক্যাম্বোডিয়ার এক বহু পরিত্যক্ত মহানগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে।

সিয়েম রিপ উত্তর-পশ্চিম ক্যাম্বোডিয়ার একটি ঘুমন্ত শহর। জুলাই মাসে এখানে দেখা যায়, গাঢ় সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা কুঞ্জ-পথের পাশ দিয়ে ধীরে বয়ে চলেছে শান্ত শ্যাওলা রঙের নদী, অনুভব করা যায় সারা শহরে ছড়ান পুরানো কালের ছাপ। এছাড়া আছে অনেক দ্রষ্টব্য-স্থল, আর বহু আগেকার ফরাসী উপনিবেশিকতার ছাপ ও চাইনিজ স্থাপত্যকলার সুস্পষ্ট প্রভাব। এই *সিয়েম রিপের* মাইল পাঁচেক উত্তরে রয়েছে *অ্যাংকর ওয়াট* এর মন্দির, *খেমের* ভাষায় যার অর্থ *মন্দিরের শহর* এবং এই যুগের বিশ্ব-বিখ্যাত দ্রষ্টব্য এবং তীর্থস্থান *অ্যাংকর ওয়াট*।

আধুনিক এবং প্রাচীন ক্যাম্বোডিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতিগোষ্ঠীকে *খেমের* বলে উল্লেখ করা হয়। উত্তর পশ্চিম ক্যাম্বোডিয়ার ২৫০ বর্গমাইল জুড়ে এই বৃহৎ অঞ্চল ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ছিল *খেমের*দের সাম্রাজ্য, এরা ছিল তখনকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী আর সেই প্রাচীনযুগে এদের রাজ্য-কালে শহরের জনসংখ্যা এক মিলিয়নেরও অধিকে পৌঁছেছিল বলে অনুমান করা হয়। এই সুবিশাল দীর্ঘ পরিত্যক্ত শহর ছিল একদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম মহানগরী।

শ্যাম কাম্বোজে ওঙ্কার-ধাম মোদেরই প্রাচীন কীর্তি;

কোন ছোটবেলায় অনেক শোনা প্রায় ভুলে যাওয়া কবিতার লাইনটি মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠেছিল হঠাৎ যখন অনেকদূর থেকে প্রথম চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল আজকের *অ্যাংকর ওয়াট*। *অ্যাংকর ওয়াটের* আকর্ষণীয়তা এতই অভিনব আর অনন্য যে এই দৃশ্য প্রথম কয়েক মুহূর্ত ধরে মানুষকে করে দেয় বিহ্বল আর মন তখন হারিয়ে ফেলে এই বিশালত্বের সৌন্দর্য বিচারের ক্ষমতা। কিছু পরে চোখ অভ্যস্ত হয়ে আসে স্থাপত্যের এই অবিস্মরণীয় সৃষ্টি-কার্য্যের সৌন্দর্যে, এবং মনে প্রশ্ন জাগে, কারা তৈরি করেছিল এই অপরূপ সুবিস্তৃত মন্দির মালা, কোন সেই শক্তি-শালি জাতি, যারা সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এতটাই অগ্রসর ছিল যে এমন উচ্চমানের স্থপতি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটিয়েছিল সেই বহু পুরানো যুগে?

অ্যাংকর ওয়াটের মন্দিরগুলি কে সারা বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় ভবন বলা হয়, এখানে আছে অসংখ্য মন্দির।

কিছু ঐতিহাসিকের মতে,কয়েক শতাব্দী আগে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সব কয়টি দেশই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই সাংস্কৃতিক বন্ধনের ভিতরে ছিলনা ভারতের কোনও রাজনৈতিক অভিলাষ,বা সাম্রাজ্য-বিস্তারের দুরভিসন্ধি। উত্তর ভারত ও নেপালের মন্দিরের সঙ্গে *অ্যাংকর ওয়াট* এর প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়।

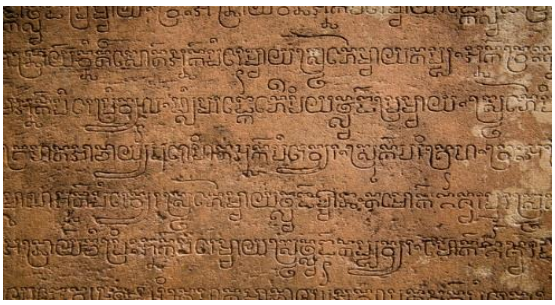

অ্যাংকর ওয়াটের প্রকৃত ইতিহাস রচনা-শৈলীসংক্রান্ত ও শিলালিপি দেখে জানা গেছে। ৮০০থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মন্দির গঠনের কাজ চলে।এই সময়ের মধ্যে সাতাশ জনেরও অধিক *খেমেরের* রাজাদের হাতে শাসনভার আসে যায়।

খেমের দের রাজা *দ্বিতীয় সূর্য-বর্মণ* বারো-শত শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুরু করেন *অ্যাংকর ওয়াটের* কাজ , পূর্বসূরিদের প্রথা মতো শৈবিক, বা মহাদেবের উপাসনা থেকে বিচ্যুত হয়ে এই রাজা মন্দিরগুলিকে উৎসর্গ করেন দেবতা বিষ্ণুর চরণে। *অ্যাংকর মন্দিরের* প্রধান প্রবেশ পথের পরেই আছে অষ্ট-বাহুর প্রকাণ্ড বিষ্ণুমূর্তি। এই মন্দির অন্যান্য প্রচলিত হিন্দু মন্দিরের মত পূর্বমুখি না হয়ে পশ্চিমমুখী। আন্দাজ-মত বছর তিরিশ ধরে চলেছিল মন্দির তৈরির কাজ, কেন না বিভিন্ন রাজাদের পতন ও উত্থানের জন্য মাঝে মাঝে মন্দিরের কাজ অসমাপ্ত পড়েছিল বেশ কিছু বছর ধরে।বারো-শত শতাব্দীর শেষের দিকে *অ্যাংকর ওয়াট* ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে যায় বুদ্ধ ধর্মের বিশ্বাসে যা আজও প্রচলিত রয়েছে।১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।

অ্যাংকর ওয়াটের অনেকটা বড় অংশ আজও অসমাপ্ত, ইতিহাস বলে *দ্বিতীয় সূর্য-বর্মণ* মারা যাবার পরে মন্দিরের কাজ থেমে যায়, তবে *অ্যাংকরের* অসমাপ্ত অবস্থা জনগণের কাছে এর রহস্যময়তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

কিছু পণ্ডিতের মত অনুযায়ী *অ্যাংকর ওয়াট* তৈরি হয়েছিল এই শহরের জলের প্রাচুর্যকে কৃষিকাজে ব্যবহার করবার উদ্দেশে,কারণ এই আশ্চর্যজনক মন্দিরের সৌন্দর্য শুধুমাত্র চিত্তাকর্ষক নয়,

এখানকার সুবিশাল জল-বন্টন এবং সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার পরিকল্পনার নিদর্শন দেখে বিস্মিত হতে হয়। অনেকে আবার বলেন যে এই মন্দিরের নকসা হচ্ছে, *খেমেরদের* বিশ্বাস অনুযায়ী, নক্ষত্র-সমাবেশের প্রতিলিপি। এই ৫০০ একর জমির উপর নির্মিত *অ্যাংকর ওয়াট* কে মনে করা হয়েছে মেরু পর্বতের প্রতিচ্ছবি; পাথরে তৈরি মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ, এই কল্পিত মেরু পর্বত, যার অবস্থান হিমালয় পর্বতমালার ওপারে, হিন্দু-বিশ্বাস অনুযায়ী, হচ্ছে দেবতাদের বাসস্থান, সেই মতে *অ্যাংকর ওয়াটের* এই মন্দির হিন্দু মহাবিশ্বের একটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি অথবা ক্ষুদ্র মেরু পর্বত। এতে আছে পাঁচটি চুড়া, যার গুরুত্ব বৌদ্ধ, হিন্দু এবং জৈন ধর্মে মানা হয়। *অ্যাংকর ওয়াটের* পাঁচটি চুড়াকে বিশ্বের পর্বত শিখরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর এর চারিধারের প্রাচীর এবং পরিখাকে বলা হয়েছে জগতের অন্যান্য পর্বতমালা ও সমুদ্র।

অ্যাংকর ওয়াটের আয়তক্ষেত্রাকার এলাকা প্রাচীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত, প্রথমেই দুর থেকে চোখে পড়ে বিরাট এক জলভরা পরিখা, যার আয়তন হচ্ছে, ৬৫৬ ফিট চওড়া আর সাড়ে পাঁচ মাইল চতুঃসীমার , এই জলের উপর দিয়ে চলে গেছে, বেলে পাথর দিয়ে তৈরি সুদৃশ্য ৮২০ ফিট লম্বা এক পথ যা পৌঁছে দেয় *অ্যাংকর ওয়াট* স্মৃতিস্তম্ভের প্রধান তোরণে। তখন দৃষ্টিগোচরে আসে,অদূরে সাঁকোর শেষে মন্দিরে প্রবেশের প্রথম ফটক আর বিভিন্ন উচ্চতার তিনটি মন্দির-শিখর। পাঁচটি চুড়া এখান থেকে দেখা যায়না।এ রাস্তার দুই ধারে দুই দৈত্যাকৃতির পাথরের সিংহ বসান আছে পাহারায়। পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেশ কিছু সিঁড়ি উঠলে পৌঁছে যাওয় যাবে এক ক্রস আকৃতির বেলে পাথরের চাতালে। কথিত আছে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে এই মন্দির গড়ে ওঠে রাতারাতি ঐশ্বরিক স্থপতির দ্বারা।

মন্দির গুলি প্রকাণ্ড তিন স্তর পিরামিডের আকারে নির্মিত।অনেকগুলি চাতাল বিভিন্ন দিকে বাঁক নিয়েছে,সবই যেন একটা অপূর্ব সমন্বয়ের ছন্দে সাজান, সত্যই কি এ কাজ সাধারণ মানুষের ?

এই সব অগুনতি চাতাল ও দরদালান গুলি বেলেপাথরে তৈরি কারুকার্যখচিত দেওয়ালে ঘেরা। আর এই পাথরের দেয়াল গুলিতে খোদাই করা রয়েছে জীবন্ত-প্রায় অসংখ্য প্রতিচ্ছবি যা ভাস্কর্য-শিল্পের অপরূপ মহিমায় সমৃদ্ধ; আরও আছে বিবিধ পৌরাণিক কাহিনী, দেবতা ও মানব সভ্যতার আখ্যান ও উপাখ্যান। শিলালিপিগুলিতে আঁকা ১২০০ শতেরও বেশী প্রাণবন্ত অপ্সরাদের প্রতিলিপি মানুষকে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিতে অভিভূত করে দেয়। প্রত্যেকটি স্বর্গীয় মানুষীর চেহারা একের থেকে আলাদা এবং নানা গহনা ও পোষাকে সজ্জিত দলে দলে দেবদাসীরা দেওয়ালে খোদাই করা, এতজনকে বারবার দেখেও দেখার তৃষ্ণা মেটেনা, এই বিবরণ একটুও অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়না।

পশ্চিমের দরদালানের দেয়াল ভরা রয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছবি, কৌরব এবং পাণ্ডবেরা দুইদিক থেকে এগিয়ে আসছে, পদাতিক সৈন্যবাহিনীরা একে অপরকে মুখোমুখি যুদ্ধে আহ্বান করে, সঙ্গীতশিল্পীদের সুরের মূর্ছনা বাজানোর সাথে, দুপক্ষের সৈন্যদের শিরস্ত্রাণ পৃথক।প্রধান সেনাপতি এবং অন্য কর্মকর্তারা রথ ও হাতি বা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের তত্বাবধানে ব্যস্ত, এর পরে দেখা যায় মহাভারতের মহানায়ক পিতামহ ভীষ্ম শর-বিধ্য অবস্থায় মৃত্যুশয্যার সেই চরম ছবি।

পশ্চিম গ্যালারির মাঝামাঝি রাম ও রাক্ষস রাজা রাবণের বিখ্যাত সংঘাতের ফ্রেস্কো আছে, লঙ্কার রাবণ রাজার ছিল দশটি মাথা ও কুড়িটি বাহু, পাথরের উপরে এই ভাস্কর্য অতুলনীয়। বানর সেনাদলের দৃশ্য সংঘর্ষের বর্বরতাকে কিছুটা সহনীয় করে তোলে।পুব দিকের দেওয়ালে আছে ভাগবত পুরাণের সেই বিখ্যাত

সমুদ্রমন্থনের কাহিনী; দেবতা এবং অসুর দুধ সমুদ্রকে মন্থন করে অমৃত লাভের অভিলাষে। সমুদ্রমন্থনে ছিল এক জটিল প্রক্রিয়া, এখানে অসুরেরা দখল নিয়েছিলেন নাগ বাসুকির মাথার আর দেবতারা ধরেছিলেন বাসুকির লেজ বিষ্ণু দেবতার পরামর্শে।এইসব প্রতিলিপি গুলিকে ভাস্কর নয়, চিত্রশিল্পীর কাজ বলে মনে হয়।

১৫০০ শতাব্দে *খেমের* সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত *অ্যাংকর ওয়াট* ছিল দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংস্থান, ১৪৩১ সালে থাইল্যান্ডের আক্রমণের পরেও সারা পৃথিবীর মানুষজন এই ধ্বস্ত শহরে আসতে থাকেন তীর্থ দর্শন এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষায়।*খেমের* সাম্রাজ্যের ইতিহাস আজ শুধুই পড়ে আছে *অ্যাংকর ওয়াটের* দেওয়ালের শিলালিপিতে, অনেক প্রাচীন লেখা ও অঙ্কন হয়ত আধুনিক মানুষের পাঠোদ্ধারের আগেই বিনষ্ট হয়েছে। থাইল্যান্ডের কর্তৃত্ব নেবার পর থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই *অ্যাংকর ওয়াটের* সংরক্ষণ করেছিলেন। ১৮৬০ সালে ফরাসিরা অভিযান চালায় ক্যাম্বোডিয়ার উপর, ইউরোপিয়ানদের ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি এবং অন্বেষণ ও আবিষ্কার স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। ১৮০০ শনের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপ এবং পশ্চিমের অন্যান্য দেশগুলি *অ্যাংকর ওয়াটের* যাদুতে সম্মোহিত হতে থাকে। ১৯০৮ সাল থেকে ফরাসিরা মন্দিরের সংরক্ষণের অনেক কাজও সুরু করে, যা আজও চলছে।

ক্যাম্বোডিয়ার ইতিহাস রাজনৈতিক অশান্তিতে পূর্ণ ;১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সালের খেম্‌র রুজ বাহিনীর ২০,০০,০০০ গণহত্যার ইতিহাস, এছাড়াও বর্তমানে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক সমস্যা, দুর্নীতি, এবং সামরিক একনায়কত্যের প্রভাবে বিড়ম্বিত, তবু তারা আনন্দে ও জীবনী-শক্তিতে থাকে ভরপুর আর অসীম গৌরবে *অ্যাংকর ওয়াট* কে তুলে ধরে বিদেশীর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে।

বর্তমানে ইউনেস্কো, এবং ভারত, ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ মিলে এই বিশ্ব ঐতিহ্যের জায়গাটির যথাযথ সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

References:

https://www.Wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat
https://www.who.unesco.org
https://www.sacredsites.com/asia/cambodia/angkor
https://www.tourismcambodia.com/attractions/angkor
https://www.siemreapcambodia.org/history
https://www.angkor-temple-guides.com/angkor.aspx
https://www.hinduwisdom.info/suvarnabhumi
https://www.livescience.com/cambodia
Lonely Planet; Cambodia

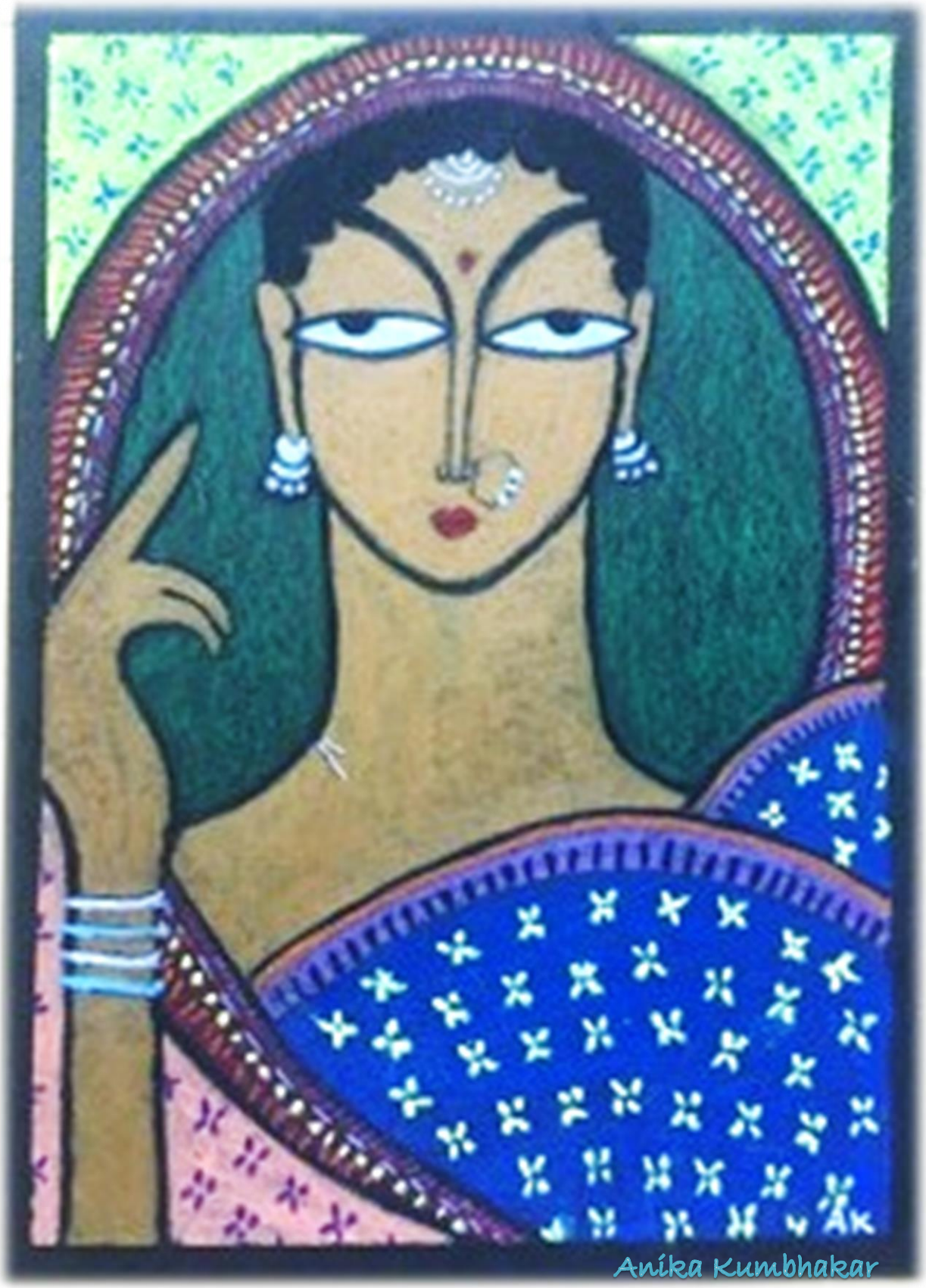
Anika Kumbhakar

Amrita Banerjee (Web: nscapes.weebly.com Email- amritabanerjee54@gmail.com)

Night Queen

Sheema Roychowdhury

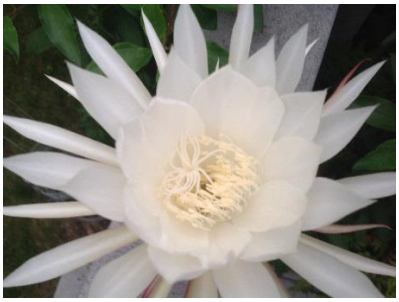

Do you recognize this flower? It is a cactus which blooms at night and closes its petals in the morning. My parents had it in our yard; we used to call this Night Queen or Rat-ki-Rani. Whenever the buds appeared, I would count the days for them to bloom. The yard would fill up with the sweet fragrance of flowers. At the time, I did not know anything about this special plant beyond its name. The evenings these bloomed, the plants would be full of flowers from top to bottom. My mom usually sent them to the club where dad and his friends gathered in the evenings to play bridge. Before the night was over, all his friends would drop by at our home asking “Memsaheb! Cha kothai...” Ma, of course, was already expecting them and was ready with tea and her delicious treats. This is the memory which washes over me whenever I see these flowers.

Now I know a little more about this unique flower. It is a fragrant, night-blooming Cereus (Epiphyllum oxypetalum) orchid cactus. It looks very similar to the exotic and almost mythical flower of the God - Brahma Kamal, a flower which grows in the Himalayas only once every fourteen years. The stems of the Night Queen contain ingredients which are antibacterial and have medicinal uses. The petals of the flower are also used by some people to make soups which promote energy and vitality; they may even work as an aphrodisiac.

I saw the Night Queen at a friend’s house in New Jersey. It was potted inside due to the cold winter and did not yet have any buds, but I recognized the plant. My heart wanted a leaf desperately. This plant germinates easily and the roots will grow if a leaf is cut and soaked in water. I could not resist, I just had to have a leaf. Thankfully, she was very gracious. Now, when the Night Queen blooms in my own home, I can relieve the memories of the tea parties my parents hosted and feel the warmth and love brought together by this flower.

*   *   *   *   *

Connections…

Another beautiful day today…

As the first monsoon hits the city roads,

Greens look greener and refreshing

The surrounding more colorful!

As I walked along my usual trail-

Guess who crossed my path?

First rain's best natural friend-

Elegantly walked out of his den

As he smells the fragrant soil

Effortlessly calling for his mate

Showing off his prowess with the most astonishing finale-

Spreading out his green and blue feathers as far as he could reach

The Peacock and the first Rain!!

Who made this connection?

I was assured that the old love song is undoubtedly true!

-Sushma

My American Sojourn

Nita Mitra

I have just come from India – Bengal – Kolkata to visit my grandson Adrian Ateesh Mitra. Ateesh was born in February this year. While in his mother's womb, he would often do the dance of 'tandava.' So I had another name for him, namely, Nataraj, or briefly, Netloo. Netloo became five months old in July, which, according to Bengali calculations, meant that he entered the sixth month of his life. This was the right time for him to have his first rice-serving ceremony or'annaprasana'. So along with my daughter and little 'Gopal Bhai' – a tiny idol of baby Krishna left behind by my departed sister - we had come all the way from Kolkata to bless our other Gopal-NandaDulal-Brojer Rakhal-Ateesh. Is it not interesting how in our culture we can endearingly merge all forms of idols namely Nataraj (Shiva) with Goplal-Dulal-Rakhal (Krishna)? The Shaivaites and the Vaishnava cult may fight with each other and much hatred may exist among their respective sub-cults. We see how during the Kumbha Mela these various religious orders have to be given their due importance, without which tandava may prevail. But us lay folk can effortlessly combine the various traditions of religiosity. We feel deep in our hearts that many roads may meet the ultimate Supreme Being. I am not a deeply religious person, but I do think that inter religious faith may bring peoples of the different parts of the world closer and nearer to their own God who I feel is deeply entrenched in their hearts.

Here are some of my impressions about this country. I know that all of you have spent many years of your life in this part of the world, which you have experienced and understood more comprehensively than me. But it might be of some interest to you to see how this country impacts upon us superficially. I agree that what we see initially may only give us a short-sighted view and may lead to a partial perspective of little value. Yet the pictures may be presented to see how it compares with the long-sighted understandings.

My six weeks tourist's version, if I may call it, may only be skin-deep. Nonetheless this is what I would like to share with you. I had carried with me some of my fears and trepidations when I came to America. Coming from a developing country, I had felt that the fast pace of American life, the vastness of this continent, the lifestyles, the sheer scale of the economy's consumerism and so on would completely drown myself and my ethnic identity. However, when I reached Kingston in New York State, I saw my fears had been unfounded. With the warmth and graciousness of the people that I came across, I saw all my reservations disappear in no time. My experience on the whole was pleasant, to say the least. Within the fast pace of life I saw how the youth were hard working. I found the retirees negotiating life in their own way and at their own pace. My daughter-in-law's mother Marianna was lamenting that she failed to find much trace of religiosity among the young. She did not see them going to church or other places of worship in large numbers. Not many prayed to God and so on. But isn't it true that 'work is worship'? In this

sense of the saying, the youth seemed to carry deep religiosity within themselves. The peace and tranquility and ever-embracing inclusiveness that I found here were incredible.

New York City and its skyscrapers had indeed set my head reeling. I was scared to look up and see the beautiful frescoes of its Grand Central Station for I felt I might have vertigo. But I did look up and found my fears to be unfounded. I was soothed by the scenic beauty of the Hudson Valley and of course the green cover of the Catskill Mountains. I would have missed seeing the panoramic view of the Catskill Mountain Range had not my college friend Pradipta (whom I got to see after many… years) and her husband Manas-da invited me to their home in Binghamton. The three hours journey that we put in to reach their place was simply awesome and a treasured experience. Manas-da's route instructions were so meticulous that we negotiated the journey smoothly and effortlessly, lapping in as much nature as we possibly could take in. Their warm hospitality set me and Pradipta on reverse gear, to our college days. We picked up the threads which we felt we had just left behind for only some days. In our conversations flowed in friends, yarns about them, our teachers, and times and of course our green horn lives. Telephonic conversations also flowed in between. A dear friend came all the way from Cornell to meet us. Such an eventful stay will remain etched in my mind forever.

Coming to the centers of learning, namely Bard College, the New York University at New Paltz and Binghamton University, Vestal moved me such that it would be difficult to put it down in words. It was amazing how committed the faculty were and what excellent academic environment these places had ensconced where all the streams merged so to say – the students, the teachers, the diverse disciplines and discourses. Being the summer vacation time I was unable to meet many. But, whatever little interaction that I could make, made me realize what talent pools these places contained. The humility and scholarship of the faculty really impressed me.

My surface observations, as most may call it, may not be totally off-the mark. My experience at least tells me so. Inner tensions and turmoil apart I find people to be more or less the same all over the world. Some qualities are innate and hence the dividing walls tend to fall apart. We are thrown into the sea of humanity where love and respect predominate. The spirit of sharing in the thoughts and feelings of others is all that matters. This is what our great writers, poets and thinkers have tried to bring out in their creations. I would like to conclude my observations with a small prayer. May each of us flower into ethical, moral and self-respecting person, for then we shall be able to understand and forgive the limitations of others.

A Puja from the Sixties

Asish Mukherjee

As the years roll on, Anil has realized that gazing back can be more delightful than looking ahead. Often he takes leave from the present and pushes back the dusty drapes of time. Like a distant landscape emerging though purple mists, a sunny verandah with red floor emerges into view. For most of his childhood and youth, this had been his watchtower. In early 60s he was not even tall enough to reach above the brick balustrade. He would push away the potted cactuses his mother had carefully arranged, and fit his tiny head into the concrete filigree. He gazed at the bubbling flow of life and inhaled its flavors.

He could see a wide vista of five main roads intersecting. The area was called Ekdalia. In those days there were few tall buildings to hinder his view. Most houses were three to four storied painted yellow or off-white. They had large windows with green shutters and black bars, and often a large verandah. To the east he could see as far as the railway station, and marvel at the constant flow of hopeful people walking into town for a living. They would bring in all kinds of merchandise. Some had baskets balanced on their heads, while some carried strange contraptions like stringed equipments for treating cotton or wheels for sharpening knives. Towards the West he could almost see the red roof of a movie theater. In front were wide avenues with tram tracks. The clank of tramcars' metallic wheels used to wake him up early. They used to carry myriad folks up and down to their diverse destinations, from four in the morning till midnight. Anil smiled to himself, as distant visions started getting clearer. He realized he had learned more of life from his verandah than his books.

Right in front was a rickshaw stand. A row of hand pulled rickshaws were always lined up in a rank, On hot summer afternoons their sturdy pilots would rest, making a dough of gramflour in shiny aluminum plates or slapping "khaini" to prepare their favorite addictive. At busy times, their hand held bells would make a delightful concert with the honking of cars and cries of street vendors.

Seasons came and went. Summer was oppressive and tar surface of roads started to melt. Monsoon beat upon the busy roads with ferocity. Roads got flooded, cars got stuck, and rickshaws had their heyday. Then something seemed to change. As Anil looked out of his balcony one September morning and followed the waterman spraying the streets, he sensed that the sunrise was mellow and the sky so blue. His mother told him that Goddess Durga is coming to Earth.

"What are you doing? Dreaming in the verandah?" a little girl's voice would cry out. This was Mala, Anil's cousin who was his constant childhood companion.

"Come, see what we are getting for Puja gifts", Mala cried out in glee.

Every relative sent a gift to their extended family members, especially the youngsters. What joy Mala and Anil felt at the sight of new clothes and shoes!

The ring knockers at the front door sounded. Local boys have come to collect contributions for the public Puja. In those days, twenty rupees used to bring a broad smile to their faces.

"Aunty, do come early for Anjali every day, and do not forget the special lunch on Astami" the collecting boys said.

Barely a month remained for the Pujas. Road workers started patching potholes, sidewalks started getting paved, and some homeowners put a fresh coat of paint on their weather ravaged walls. Bamboo structures started raising their heads everywhere, and soon underwent a metamorphosis into architectural marvels called pandals where the Goddess would be worshiped. The view out of the verandah now took on a different hue. As evening fell, streams of people in elegant dresses flooded the roads. They carried large shopping baskets and held on to excited children, quite oblivious of the heat and dust. Street peddlers shouted "whole sale- whole sale" in distorted English as they spread out their wares of cheap jewelry and clothing on uneven sidewalks, while the more affluent elbowed their ways into crowded departmental stores. Life seemed to have acquired a new meaning for these weeks. The impoverished city had changed into something rich and wonderful by miracle.

Anil went shopping too. His mother and sister held on to one of his arms each, so he did not get lost in the crowd. They visited large stores, where sales persons opened up heaps of saris for each customer with a smiling face, sometimes only to hear that they were not to their liking. Very few stores were air conditioned, and Anil could soon feel his clothes get drenched with sweat. His moment of happiness came when they stepped into his favorite store. In those days, there were no readymade garments, most clothing had to be tailored to fit. Anil's favorite fabric was terrycot made by Gwalior Suitings. He stood proud as the tailor took measurements of his tiny frame. His father was a busy physician, who was mostly absent from these shopping expeditions. Anil's biggest delight was walking to his dispensary in triangular park after an exhaustive evening of shopping. His father would immediately order his favorite treat – ice cold drink from nearby Spencers. What a crowning finale!

"Wake up wake up" his father's stentorian voice broke into Anil's slumber. "It is Saptami". Anil opened his eyes to the golden sunlight, and saw the heap of newly tailored clothes and a shiny pair of shoes by his bed. His father held out a package for him with a twinkle in his eyes. Anil's heart leaped at the sight of a bunch of illustrated classic comics, a love for which was shared strongly between father and son.

The house was now swarming with people. Anil's oldest aunt and his son had come from Asansol to spend the puja with them. Mala and his mother had arrived in their shiny Hindusthan car. They were all getting ready for visiting the local puja.

The local Puja was called Ekdalia Evergreen, situated in a green island at the confluence Ekdalia and Gariahat. In those days it was a homey club and had not sprung into the top five pujas of the city.

Local boys were doing rounds in the streets and announcing in steady monotonous rhythm "those who want to do Anjali, please come to the pandal". Anil's mother had prepared an offering for every lady of the family. This was a red earthenware plate with fruits, flowers, sweets and vermillion. Everyone carried their assigned offerings and walked to the puja venue. Anjali started. Fresh flowers were distributed to each participant and a priest started chanting Sanskrit hymns. Anil understood some of the meanings. The priest was saying "Goddess Durga, you are everywhere – you are present in our slumber, in our errors, in kindness, in anger, in love, in peace, in knowledge, in ignorance, in shame, in death - you destroy evil and show us the way to light." He felt he was on the brink of a strange realization he could not fully understand- like the fragrance from a hidden garden, like the glow of the unrisen sun. He wondered if there was a mysterious beauty in this universe which his books have not taught him yet. He had decided to request God for good scores at his exams, but suddenly that seemed too puny a prayer. All he could do was hold out his folded hands.

Everything in Bengali culture culminates in a big feast. This was usually held at Mala's house. There were long rows of people seated on tiny rugs on the ground. Food offered to God was served first. Then came many varieties of fried vegetables, Khichuri- a mixture of rice and lentil cooked together, vegetable curries, many types of sweets and yogurt, and on the last day of Puja fish was also included.

As evening fell, lights came on. The city's gritty concrete jungle became a wonderland for a few days. Lights glittered everywhere, people were smiling and greeting each other. There were families, groups of arrogant youths, and shy dating couples, all out to taste the feast of life. There was no longer a separation between people, only goodwill and love.

Those heady days of Puja were soon over. School would still remain closed for a few more weeks. Guests have all left by now. This was when father made his delightful announcement.

"So I have worked hard all through the Puja days" he said smiling, "and now is my turn to spend time with my family. With a lot of effort, I have been able to get four train tickets for our family for a trip to Mussoorie – the queen of hill stations."

Anil now realized why their compounder had been leaving very early every morning and returning exhausted. He must have been standing in line for train tickets at Howrah Station. Of course, this was the only way to make reservations in those days.

A flurry of thrilling activity followed. Mother fished out an ancient "holdall". This could hold beddings and then could be rolled up with straps. A couple of steel trunks appeared from somewhere and all their warm clothes were neatly packed into them. Anil made labels with father's

name and their destination and stuck them with glue on every item of baggage. Sister produced some pictures of Mussoorie and the hotel they will be staying at. Finally the day came when they all got into a taxi and headed towards the station. The long train known as Doon express with many red coaches pounded into the platform pulled by a hissing steam engine. Everyone rushed to the doors. Anil's family found their reserved seats and sat down. Mother had brought a domestic help to make beds for them and was carrying a basket filled with dinner goodies. The ticket checker in black coat and white pants made his rounds and somberly checked all documents.

As the whistle sounded Anil saw the platform pulling away, and his known world receding. A tingle went up his spine. He stared into the darkening night at the changing landscape. Villages were passing by as the train gathered speed. Anil turned to his elder sister and said "Didi, now I know the meaning of the new word you taught – romance!

He now smiled wistfully as he came out of his reverie. He thought time is powerful, but memory is even stronger. Wonders from the past have melted away like Cinderella's castle, but they still shine bright and show the way through the changing tracks of life.

EKDALIA EVERGREEN 2009 Pandal

EKDALIA EVERGREEN 2013 pandal

Wild Wild West!

Vaswati Biswas

If you have ever been to Yellowstone National Park, then you know the sense of awe you experience with the breathtaking views and scenery. But who knew the exciting drive from the foothills of grand Rocky Mountains in Denver to Yellowstone, through Wyoming and Black hills of South Dakota would take you to beating hearts of the Wild West. As we cruised to South Dakota, my thoughts instantly got connected to cowboys and ranches, pioneers, native Indians and the gold rush of the Wild West.

Black hills are located on the western edge of South Dakota with abundant scenic landscapes and varied wildlife. Black hills are called so because of their dark appearance from a distance, as they were covered with dense trees. The local native Indians, the Lakota tribe called it "**Paha Sapa**". The hills had once promise of gold but the gold rush is now history. It may not produce gold but luscious green forests are still rich with beauty. One of the most visited tourist spot of this region is **Mount Rushmore**. When we reached there, it was a beautiful summer afternoon with deep blue sky. Four American Presidents- Roosevelt, Lincoln, Jefferson and Washington are carved in the cliff of Black hills 60 feet tall. To see in person this monumental masterpiece was grand and amazing. The walkway to the viewing platform is flanked by pillars with flags of each of the fifty states. I have been told

Mt. Rushmore

the evening illumination on the mountain is spectacular but we missed it. Adjacent to Mt Rushmore is the Custer State Park. A tangle of winding mountain roads and tunnels leads to the **Custer State Park** in the Black hills**.** The 71,000 acres of prairie grasslands and mountainous terrains are home to buffalo, pronghorn, bighorn sheep, mountain goats and many more. Our favored luck supported to see the herds of buffaloes, a big horn sheep and a few mountain goats.

Custer Park boasts of several scenic drives, Needle highway is a unique one. It was a spectacular drive with a series of twists and turns through rugged granite mountains and meadows. When we were crossing the Sylvan Lake, needle like granite formation pierced the horizon along the highway called Needle's eye. This is how the road's name came into existence. Emerging from the Park we headed to the still under construction **Crazy Horse Memorial.** The **Crazy Horse Memorial** is an effort to honor the legacy of

brave Lakota leader, Crazy Horse with heritage and traditions of Native Indians.

Crazy Horse Memorial

This amazing mountain carving started in 1948; over 60 years in making and when completed it will be the largest mountain carving in the world. It is a totally private funded project with no government assistance. The onsite Indian museum of North America and Native American education and cultural center gave us insights into the lives of Native Indians from pre Columbian to contemporary times. As we sat by the lofty memorial in the tranquility of the Black hills we felt in awe and fascinated by the history of the Lakota Sioux cultures. We crossed the black hills region and went further east to witness geographical wonders of **Badlands National Park**. The Lakota called Mako Sica meaning Land bad. The land here is ruthlessly ravaged by wind and water giving rise to some colorful spires, pinnacles, massive buttes and deep gorges. The landscape of the rugged beauty in the morning sun was just stunning. It looked like a miniature version of the Grand Canyon. We didn't spend a long time in Badlands but there are several wonderful trails to explore and look out for fossils. The park has one of the most fossil accumulations in North America.

Badlands, Wyoming

It was time to go back to Wyoming for our final destination to Yellowstone Park. We halted at Gillette for the night, but on our way we stopped at the **Devil's Tower** in Wyoming. The **Devil's Tower** is a gigantic, natural rock formation that looks like a tall tower shaped monument.

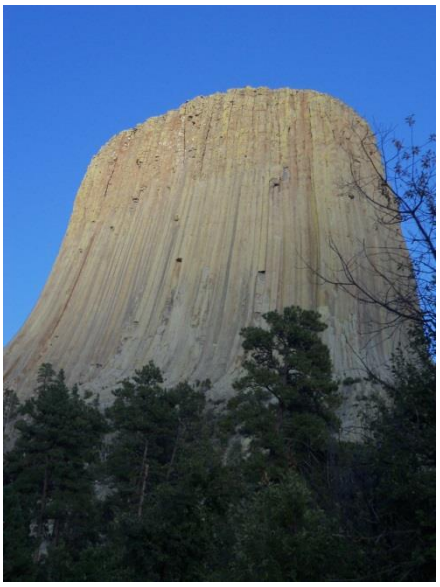

Devil's Tower

This place is revered by the native Indians as sacred though it is very popular for rock climbing now. The **Devil's Tower** is the first national monument established in 1906 by

Theodore Roosevelt. The landscape surrounding the Devil's Tower is amazing, composed of red sandstone and siltstone cliffs above the Belle Fourche River, known as spearhead formation. It is one of those places that being there in person does so much more than pictures. As we drove out of the monument we came across a Prairie dog town at the base of the tower.

Prairie dogs at the Devil's Tower

These black tailed furry animals live in underground communities called towns and commonly found in the grasslands of central and western North America. The following day from Gillette, we drove through the cattle ranches of sparsely populated state and reached Sheridan, known as Wyoming's Jewel. Sheridan area is home to one of the highest concentrations of Indian War battle sites in the USA. The town is surrounded by a magnificent backdrop of the **Big Horn Mountain**. Big Horn Mountains are majestic range of peaks of the Rocky Mountain chain, most sore over 9000 feet. Bighorn is named so because of numerous bighorn sheep found within the range.

parkland crossing through the states of Wyoming, Montana and Idaho.

The rock formation on the Bighorn

The scenic road drive meandering through this beautiful mountain showcases limestone outcroppings, Shell canyon, crystal clear lakes and glacier carved valleys. The initial climb to sheer mountain walls was beautiful, as we reached the higher elevation on the top, it was a surreal experience. The other side of the Bighorn was the spectacular Canyon with fantastic rock formations and took us right by the Shell falls. After crossing the incredible Big Horn Mountain we reached the town of Cody. Cody is just a few miles away from pristine wilderness serving as the Eastern gateway of the Yellowstone National Park. Cody.is named for its founder, Buffalo Bill Cody and remains full of old west adventure. The town attracts cowboys and tourists alike with reenactments of famous shootouts, rodeos and the Cody stampede.

Yellowstone National Park is the world's first national park with 3,500 miles of

Bison grazing by the Yellowstone River

This fascinating park has both geography and geology. The park has five entrances, northern region being outside the Yellowstone Caldera- the largest super volcano on the continent. When we arrived in the park, at the eastern entrance we drove through the peaceful Hayden valley, with the Yellowstone River on the eastern side of the roadway. Soon we were introduced to wild life, surrounded by grazing bison in the lush green meadows. Majority of the park is over 7000 feet and the weather changes constantly. Scientists' estimate, the Yellowstone Caldera, if it erupted, would cast a 3 feet layer of ashes across the American West. The southern region of the Park boasts of the concentration of geothermal features, home to the iconic geysers, such as **Old Faithful**. The **Old Faithful** geyser is located in the upper Geyser Basin with several other geysers. We were spellbound as it erupted and expelled hot water to a great height right dot on time. The **Morning Glory Pool** in upper Geyser Basin was another favorite destination which resembled the flower and displayed exquisite colors.

Old Faithful Geyser

From Upper Geyser basin we moved to Midway Geyser Basin by the banks of Firehole River. Here we saw the incredible clear shades of blues and greens in Turquoise pool, Opal Pool, Excelsior Geyser Crater and the grand multicolored **Grand Prismatic Spring**, the largest hot spring in the park.

Grand Prismatic Spring, Mid Geyser Basin

The volcanic activity that causes this phenomenon is so impressive**. Fountain Pots** in the lower Geyser Basin is another geothermal activity in the park. There are several hot mud pots, fumeroles and hot pools, of which Red Spouter exhibits all the thermal features of different seasons.

Hot bubbling mud pots

After winding around the Yellowstone River, visiting Geysers, dozen hot pools and mud pots, the next day we arrived at the Upper falls and Lower falls of the Yellow Stone River. **Artist Point** at lower falls is a cliff on the south rim of the Grand Canyon of the Yellowstone.

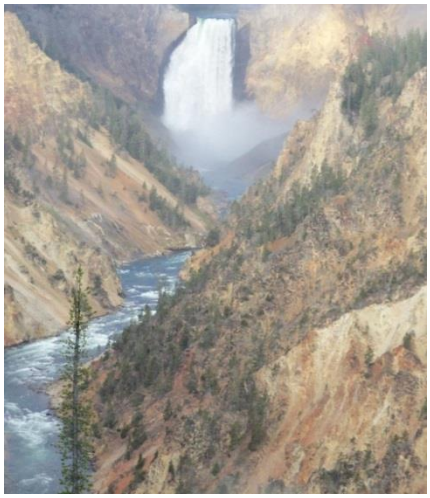

Artist Point- Grand Canyon of Yellowstone

Here the Yellowstone Falls cascade into the Grand Canyon, which is more than 800 feet deep. The exquisite colors of yellow, red, ochre combined with blue green enveloping slopes of the Grand Canyon is a scenic vista, especially during sunset and sunrise. This incredible spot was my absolute favorite place in Yellowstone. Probably Yellowstone bears the name from the golden hues of the canyon.

Yellowstone is vast and varied. The valley and forest inside the park are home to several wild lives. Bears and wolves can be spotted in the early morning hours or dusk, besides bison and elks. The magnificent Yellowstone Lake is the largest lake in the high altitude. Walking along the shoreline, the view was breathtaking with snow-capped mountains in the distant. In the south west area of the lake is the **West Thumb Basin** consists of geysers, fumeroles including some in the lake itself. In the Northern part of the park outside the Caldera, lies the **Mammoth Hot Springs**. **Mammoth Hot Springs** are different from thermal areas elsewhere.in the park. The hot springs change all the time here.

Mammoth Hot Springs

Constantly terraced formations made by the springs with orange and white colors are picturesque and gorgeous. Each of the area in the Yellowstone Park is unique and offers extravagant beauty of untouched nature and wilderness.

We exited south from Yellowstone and the weather was delightful. Another favorite part of the Yellowstone vacation was driving

along the pristine clear Jackson Lake and Jenny Lake by the majestic peaks of Grand Tetons. Grand Teton National Park is only 10 miles south of Yellowstone and the park is named Grand Teton, the tallest mountain in the Teton Range of the Rockies. The regal peaks have receding glaciers, standing 7000 feet above valley floor with wild summer flowers at the foothills. Emerging from the park we headed back to Denver to return home

Grand Teton range with a meadow of wild flowers

Snow clad lofty Teton peaks

"The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes." Indeed this marvelous journey of Wild West was an eye opener, enriching my soul with the unforgettable memories of nature's wonder.

‘నా ఉనికి’

Naa Uniki

My Identity (in Telugu)

Sushma Madduri

Bhramar was staring at the crisp glass windows of his office cabin located in the heart of New York City. He was keenly observing the snowflakes as they touched the glass pane and quickly melted away- leaving no trail behind them, except for a few drops of water. He was lost in deep thought as he just finished reading a letter from his mother. The modern email system hasn’t reached her doorstep. She still follows the old hardcopy style and is amused by the way it works, even across the oceans! She lives in a remote village, Narayanpet, in the south Indian state of Telangana.

Bhramar belongs to a weaver family. They weave the traditional ‘narayanpet’ sarees for a living. The loom has been handled as the family business for generations now. A sensitive nose can easily catch the smell of the fabric color smudged at several places on the paper she used for writing the letter.

Over the decades, due to poverty, unemployment and illiteracy, weavers haven’t been doing well in business and some of those families have suffered hard to earn a single decent meal per day. This has forced people to give up the craft and look for alternate employment. Bhramar learnt a lot from these stressful situations as a kid early, especially after his father’s untimely death and hence decided not to take up the family business. He succeeded in convincing his mother to send him to school. His mother did small chores in the nearby villages and paid for his school. He slowly climbed the ladder of success, from a primary school in his village to the degree college in a nearby town. He worked very hard, sacrificing little pleasures as a child to reach his goal in life. He secured a job in the city in a software firm, and is currently recruited for an onsite assignment in NY City. His peers consider his academic journey a true inspiration.

Today, he received a letter from his mother, on occasion of his birthday. It was a long letter- different from her earlier ones. He slowly re-traced his steps back in time as he read her letter,

“Bhramar babu (my little boy in ‘Telugu’),

May God bless you with a long life. Happy birthday to you. I am fine here, and hope the same with you there. I received the money you sent last week. Your uncle Rajanna handed over the bank passbook yesterday. He praised you a lot. He said, you are doing very well and will take good care of me. He added with a smile, that I should be really proud of you! You have reached your goal and are fulfilling your responsibility as a devoted son. I am really happy for what you have become today.

I am sending you a new shirt with this letter. Hope it fits you. It has been a year since I last saw you. I am sure you must have lost weight. You work so hard round the clock. I stitched the shirt last week. Janaki (our neighbor) helped me finish it, as my eye-sight is getting worse with time.

Babu, I have a bad news to share. Your best friend Raju's father passed away last week. He has huge loans to pay off. He has been ill for sometime now. This is the situation with many of our neighbors in the weaving business. Weaving has become a sick industry. I don't know if the reason is globalization, and craze for foreign brand clothing. Youngsters like you should think of ways to revive such gifted craftsmanship. Give a thought of supporting your family business, which supported us for generations. Don't ignore it. It may not be as attractive as your job, however, many families still depend on it for a living. This handicraft needs caring hands to keep the wick burning.

Babu, any form of art is a God's gift and not everyone can master it. By Almighty's grace you have had a chance to learn it from your father at an early age. Don't forget the loom (our mother). This is my deepest desire and also probably my last wish as your mother. Let your education and wisdom help you realize your role in reviving this beautiful craftsmanship. It is your identity.

May God bless you,

Amma"

Bhramar came out of his thoughts, with the buzzing of his phone. 'Hello…,who is calling?", "Hi BHARAM, Bill here. The meeting starts in another 15 minutes, please get the presentation we put together yesterday on your way here. See ya!".

Bhramar smiled for a moment, but felt a deeper void in his heart as he put the receiver down. His mother named him 'Bhramar' – which means a honey bee in Sanskrit. A honey bee works very hard to travel places and collect the best honey from different flowers and carefully transports back to the comb for storage. He still remembers the sparkle in her eyes, whenever she called his name back home. She often said that, she probably knew him very well and what he will become even before he was born, so chose that name.

Due to the foreignness of the name, inspite of seeing it written several times, his colleagues often call him 'BHARAM'. This means illusion in Sanskrit, a completely different meaning from the original name. He often wondered, if that was their lack of understanding or a careless attitude? However, he was too shy to correct them. He feared inside that, one day he might actually forget his original name.

At that moment, he recalled the last sentence from his mother's letter. "It is your IDENTIY". He said to himself, "My name is not just any other word, but my 'identity'. How can I be so careless about my identity? Similarly my family business is also my identity"!

He looked back at the window. The snowflakes were nowhere to be seen. They no longer have an identity. They originated from water which has an identity. The 'Origin' is the identity. Similarly, the **loom** is his identity. He should be proud to say that he belongs to the weaver's family. They

weave clothes that everyone can wear, clothes that also sometimes give people an ‘identity’! He hasn’t thought on those lines till today.

At that moment, he made up his mind as per his mother’s wish to explore possibilities to stabilize and secure his family business. He looked out of the window with a peaceful mind. The snowflakes reminded him of the flower designs his father weaved on a bridal saree.

Soon, Bhramar quit his job and started out an independent business with the help of a local bank near his village. He employed a few of his fellow weavers to revive the family business of weaving the beautiful ‘narayanpet sarees’. He embarked on the idea of online sales and shipping by connecting to local shipping agencies. He employed people for taking care of different aspects of the business, thereby creating jobs to a few others. He once again proved to be a inspiration for his peers, this time with his true identity!!

Dedicated to… the Narayanpet Weavers in Telangana, India.

(Inspired by Ethnic Day Celebration on All India Radio, June 19th, 2015)

Greater Binghamton Bengali Association: 2015

Committees	Participating Members
Finance	Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Sambit Saha, Pranab Datta, Samir Biswas.
Publicity	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Ashim Datta, Parveen Paul, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Manas Chatterji.
Puja Website	Anju Sharma.
Puja Magazine	Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Sujoy Chakrabarty, Sohini Banerjee.
Puja Ayojon	Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Sheema Roychowdhury, Pradipta Chatterji, Anasua Datta, Anju Sharma, Manashi Paul, Shamla Chebolu, Abha Banerjee, Maitrayee Ganguly.
Prasad & Bhog	Vaswati Biswas, Subol Kumbhakar, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury, Damayanti Ghosh, Manashi Paul, Shamla Chebolu, Sohini Banerjee.
Decoration	Sohini Banerjee, Damayanti Ghosh, Anju Sharma, Vaswati Biswas, Parveen Paul.
Lunch & Dinner	Dilip Hari, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Ashim Datta.
Pratima Transfer	Sambit Saha, Ashim Datta, Samir Biswas, Subal Kumbhakar, Sujoy Chakrabarty.
Local Artist Cultural Program	Ruby Biswas.
Invited Artist Cultural Program	Dilip Hari.
Audio Visual Setup & Stage Management	Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Sujoy Chakrabarty.
Hall management	Samir Biswas, Sambit Saha, Dilip Hari, Sheema Roychowdhury, Anju Sharma, Maitrayee Ganguly.
Reception	Utpal Roychowdhury, Samir Biswas, Sambit Saha.
Cross Functional Coordination	Utpal Roychowdhury, Sambit Saha, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Subal Kumbhakar.
Patrons & Donors	Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta Chatterjee, Hiren & Dipali Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray.

Greater Binghamton Bengali Association: 2015

Saturday, October 24, 2015

Durga Puja Programs

Morning Session:	
8:00 AM – 12:30 PM	Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)
12:30 PM – 1.30 PM	Prasad + Vegetarian Lunch
1:30 PM – 2:00 PM	Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
2:00 PM – 2:30 PM	Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

2:30 PM – 5:45 PM	Break (volunteers assemble in ICC at 5:15 PM)

Evening Session:	
5:45 PM – 6:15 PM	Sandhya Aarti + Dhunuchi Dance
6:20 PM – 6:30 PM	Local Talents - Children
6:30 PM – 7:45 PM	Local Talent Showcase - Adults
	Bengali Dance Drama - ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
	(Director and Choreographer : Ruby Biswas)
8:00 PM – 9:00 PM	Dinner
9:10 PM –11:40 PM	Invited Artists (Arfin Rana & Meghna Rajaram)

Greater Binghamton Bengali Association
invites you with your family and friends to
Durga Puja 2015
On October 24
Venue: Indian Cultural Centre,
1595 NYS Route 26, Vestal, NY 13850
Puja Contribution:
General Contributors *
$30 per person
$10 full-time student
Free admission for children
(18 years or less)
*covers all programs, lunch, dinner and entertainment.
Patrons: $300/family & above
Donors: $100/family & above
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী
A potpourri of songs and dances showcasing local talents.
Director & Choreographer: Ruby Biswas.
Arfin Rana
Sa Re Ga Ma - 2014
Meghna Rajaram
Additional information available at www.Binghamtonpuja.org

Sohini

Handmade 'kulo' - Sohini Chakraborty